ইমদাদুল হক মিলন
ভূতগাছ

ভোররাতে রবিনের মনে হলো মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কে যেন তাকে ডাকছে। রবিনের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙা চোখে চারদিকে তাকাতে লাগল সে।

রুমটা আবছা অন্ধকারে ভরে আছে। পাশাপাশি দুটো খাটে শুয়ে আছে রবিন আর ছোটমামা। মামা লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। রবিনের গায়েও লেপ আছে কিন্তু মাথাটা লেপের ভেতর ঢোকায়নি সে। মাথা ঢেকে ঘুমোতে পারে না রবিন। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

কিন্তু কে ডাকল রবিনকে!

তখুনি জানালার দিকে চোখ গেল রবিনের। চমকে উঠল। ঘুমোবার আগে রুমের প্রতিটি জানালা নিজ হাতে বন্ধ করেছেন মামা। কই, এখন দেখি একটি খোলা! আর জানালার সামনে ওটা কী?

চোখে দুতিনটে পলক ফেলে, ঘুমভাব কাটিয়ে আবার খোলা জানালার দিকে তাকায় রবিন। তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেল ব্যালকনির সঙ্গের গাছটি তাদের জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই জানালাটি ব্যালকনি থেকে বেশ দূরে এবং বাংলোর পেছনের দিকে। এ কী করে সম্ভব! এটা ওই গাছটাই তো, নাকি অন্য কোনও গাছ!

কিন্তু রবিনের স্পষ্ট মনে আছে বাংলোর পেছন দিকে কোনও গাছ নেই। জানালার সামনে তো নেইই। এখানে আসার পরই, কাল বিকেলে পুরো বাংলো ঘুরে দেখেছে সে। আর গাছটা তো ওই গাছটাই। এখানে এলো কী করে?

ব্যাপারটা বোঝার জন্য বিছানা থেকে নামল রবিন। সঙ্গে সঙ্গে জানালার কাছ থেকে সরে গেল গাছটি।

প্রচ্ছদ | ধ্রুব এষ

ভূতগাছ

ইমদাদুল হক মিলন

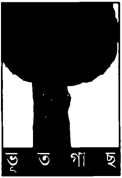

ইমদাদুল হক মিলন

ভূতগাছ

বইপত্র

বইপত্র গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স

প্রকাশনা, গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা

ভূতগাছ

প্রকাশক □
মাহবুবুর রহমান বাবু
বইপত্র গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
৩১/৩২ বাংলাবাজার, পুস্তক ভবন
ঢাকা ১১০০
মোবাইল □
০১৮১৯৯৯৪৩০৪

প্রথম বইপত্র সংস্করণ
একুশে গ্রন্থমেলা ২০০৭

স্বত্ব □
নির্বাচিতা হক
শুভেচ্ছা হক

প্রচ্ছদ □
ধ্রুব এষ

বর্ণ বিন্যাস □
নির্বাচিতা
৯০ বড় মগবাজার
ঢাকা ১২১৭

মুদ্রণ □
প্রিসিশন
ফকিরাপুল, ঢাকা

মূল্য □
৭৫ টাকা

ISBN
984 8211 02 4

উৎসর্গ

প্রিয়শিল্পী ধ্রুব এষ
যার আগ্রহে ভূতগাছ লিখেছি

এটা কী গাছ?

বাংলোর কেয়ারটেকার লোকটি মধ্যবয়সি। ময়লা নোংরা একটা প্যান্ট পরে আছে, আর খাকি মোটা কাপড়ের ফুলহাতা শার্ট। শার্টের প্রতিটি বোতাম যত্ন করে লাগানো। মাথার চুল তেল দিয়ে পরিপাটি করে আঁচড়েছে। তেলটা বোধহয় একটু বেশিই দিয়েছে। বাঁ দিকের জুলপি বেয়ে তেলের মিহিন একটা ধারা গালের দিকে নামার চেষ্টা করছে। ব্যাপারটা খুবই সূক্ষ্ম। কারও খেয়াল করার কথা নয়। কিন্তু রবিন করল। রবিনের স্বভাব এরকমই। যা দেখে সূক্ষ্মভাবে দেখে।

কেয়ারটেকারের মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ। দেখে বোঝা যায় নাপিতের কাছে গিয়ে আজই ছাঁটিয়েছে সে। হয়তো রবিনরা আসবে বলেই নিজেকে এভাবেই সাজিয়েছে। বাংলোটা সরকারি আর রবিনের বাবা বেশ বড় সরকারি কর্মকর্তা, সুতরাং বাংলোর কেয়ারটেকারকে আজ পরিপাটি হতেই হবে। কিন্তু লোকটা এমন কথায় কথায় হাসে কেন? মুখে সারাক্ষণই হাসি লেগে আছে!

রবিন বুঝে গেল এটা তার স্বভাব। মানুষের নানা রকমের স্বভাব থাকে। রবিনের যেমন আছে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার।

লোকটি এখনও কিন্তু রবিনের প্রশ্নের জবাব দেয়নি। রবিন তার মুখের দিকে তাকাতেই মুখটা হাসি হাসি করল, নাম একটা আছে।

কী?

আপনারে বলা ঠিক হবে না।

কেন?

বললে আপনে ভয় পাইতে পারেন।

রবিনের ভুরু কুঁচকে গেল, গাছের নাম শুনে ভয় পাব! বল কী!

জ্বি, অনেকেই পায়। আপনে ছোট মানুষ, আপনে ভয়টা আরও বেশি পাইবেন।

রবিনকে কেউ ছোট বললে সে একটু মাইন্ড করে। মনে হয় ছোট বলে তাকে অবহেলা করা হচ্ছে। তাছাড়া যত ছোট তাকে দেখায় তত ছোট তো সে নয়! তার এখন তেরো বছর বয়স। ক্লাস সেভেনের ফাইনাল পরীক্ষা মাত্র শেষ হয়েছে। এখন ডিসেম্বরের শুরু। জানুয়ারির মাঝামাঝি রেজাল্ট বেরুবে। ক্লাস এইটে উঠবে রবিন। এক অর্থে ক্লাস এইটে সে উঠেই গেছে। পরীক্ষা খুবই ভাল দিয়েছে। মেধা তালিকায় এক থেকে দশের মধ্যে থাকবে।

তবে রবিনের গ্রোথ একটু কম। বয়স তেরো হলে কী হবে, দেখায় ন'দশ বছরের মতো। শরীরটা বেশ রোগা। ফর্সা মুখটা খুব মিষ্টি। চোখ দুটো ডাগর। মাথায় কোঁকড়ানো সুন্দর চুল। সব মিলিয়ে রবিন দেখতে ভাল এবং বেশ সাহসী। ভূতের গল্প পড়ে, ভিসিআরে ভূতের ছবি দেখে একটুও ভয় পায় না। এজন্যে বন্ধুরা তার নাম দিয়েছে রবিনহুড। রবিনহুড নামটা বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছে। ছোট মামা রবিনকে আজকাল রবিনহুড ছাড়া ডাকেনই না। এই রবিন কিনা একটি গাছের নাম শুনে ভয় পাবে!

রবিনের ইচ্ছে হলো কেয়ারটেকারের মুখের ওপর হি হি করে একটু হাসে। ঠাট্টার হাসি।

কী ভেবে হাসল না। গম্ভীর হয়ে গেল। কেয়ারটেকার চোখের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বলল, ছোট হলেও ভয় আমি একদম পাই না।

কেয়ারটেকার সঙ্গে সঙ্গে হাসল। এইটা শুনলে পাইবেন।

না, পাব না। তুমি বল।

সাহেব যুদি শোনেন গাছের নামটা আমি আপনেরে বলে দিয়েছি, খুব রাগ করবেন।

নামটা বাবা জানেন?

জ্বি জানেন। সাহেব তো অনেকবার এখানে আসছেন। আপনে সাহেবের কাছ থেকে নামটা জাইনা নিয়েন।

এবার বেশ জেদ হলো রবিনের। রাগি গলায় বলল, না, আমি তোমার কাছ থেকেই জানব।

কেয়ারটেকার হাসল, তাইলে আমারে একটা কথা দেওন লাগব।

কী কথা?

আমি যে গাছটার নামটা আপনেরে বলছি এটা কাউরে বলতে পারবেন না।

আচ্ছা বলব না।

এবার সাবধানী চোখে চারদিকে তাকাল কেয়ারটেকার। তারপর রবিনের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, এই গাছের নাম ভূতগাছ।

রবিন চমকে উঠল। ভুরু কোঁচকাল, ভূতগাছ?

জ্বি।

বল কী! গাছের নাম ভূতগাছ! এরকম নাম তো কখনও শুনিনি।

কোথা থেকে শুনবেন! দুনিয়াতে এই গাছ আর থাকলে তো। এই একখানাই আছে।

এরকম নাম কেন হলো গাছটির?

অত কিছু বলতে পারব না সাহেব। তবে গাছখানার অনেক কায়দা কানুন আছে।

কায়দা মানে? গাছের আবার কায়দা কী! গাছ কি মানুষ?

কেয়ারটেকার আবার হাসল, মানুষের চাইতে বেশি।

এই প্রথম কেয়ারটেকারের ভাষা কানে লাগল রবিনের। শুদ্ধ অশুদ্ধ মিলিয়ে কথা বলে সে। কিন্তু গাছের নাম ভূতগাছ এ কেমন কথা! গাছটির নাকি আবার কায়দা কানুনও আছে। অদ্ভুত ব্যাপার তো!

একপলক গাছটির দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, তুমি আমাকে সব খুলে বল!

এখন না, পরে বলব।

কেন?

দুএকদিন এখানে থাকার পর বললে বুঝতে আপনের সুবিধা হবে।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কেয়ারটেকার তার আগেই বাংলোর ড্রয়িংরুম থেকে বাবা ডাকলেন, মঙ্গল।

সাহেব ডাকতেছেন আমি যাই।

কেয়ারটেকার ছুটে চলে গেল। তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রবিন মনে মনে বলল, কেয়ারটেকারের নাম মঙ্গল?

খুব কাছ থেকে ভারি গলায় কে যেন বলল, হ্যাঁ।

কে, কে কথা বলল!

চমকে চারদিকে তাকাল রবিন। কই, কেউ তো নেই এখানে! বাংলোর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। সামনে সেই গাছ। রেলিংয়ের মাথার ওপর ছাতার মতো ছড়িয়ে আছে ডালপালা। কথা তাহলে বলল কে! রবিন স্পষ্ট শুনল। বেশ ভারি গলা।

তারপরই হেসে ফেলল রবিন। ভাবল আসলে কেউ কথা বলেনি। সে মনে মনে প্রশ্ন করেছে মনে মনেই উত্তর পেয়েছে। উত্তর পাওয়ার পর তার মনে হয়েছে অন্য কেউ উত্তর দিয়েছে। এরকম ভুল মানুষের হয়। তাছাড়া প্রশ্নটা তো রবিন মনে মনে করেছে, শব্দ করে বলেনি, কেউ যে উত্তর দেবে, কেমন করে দেবে! মনে মনে বলা কথা কি কেউ শুনতে পায়!

রবিন তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গাছটি দেখতে লাগল। বহুকালের পুরনো গাছ। অনেকটা কড়ুই গাছের মতো দেখতে। ঝিরি ঝিরি পাতাগুলো গাঢ় সবুজ এবং বেশ পরিষ্কার। একনাগাড়ে দুতিনদিন বৃষ্টি হওয়ার পর গাছের পাতা যেমন পরিষ্কার হয়, ঠিক তেমন।

পাতাগুলো দেখে রবিন বেশ অবাকই হলো। শীতকালে গাছের পাতায় ধুলো জমে থাকে। সবুজ রঙের পাতার ওপর পড়ে ধুলোর আস্তরণ। বৃষ্টি না হলে সেই আস্তরণ পরিষ্কার হয় না। এই গাছের পাতা তাহলে এমন চকচকে হয়েছে কেমন করে! নদীতে নেমে গাছটি গোসল করেছে নাকি!

রবিন হাসল। ধুৎ কী সব ভাবছে সে। গাছের কি হাত পা আছে, গাছ কি চলাফেরা করতে পারে যে নদীতে নেমে গোসল করবে? গাছটির নাম ভূতগাছ শোনার ফলেই এরকম কথা মনে হয়েছে তার। আর বাংলোর গা ঘেঁষেই যেহেতু বয়ে যাচ্ছে নদী, নদী দেখেও গোসলের কথা মনে হতে পারে।

তারপর নদীর দিকে তাকাল রবিন। কী রকম উদাস হয়ে বয়ে যাচ্ছে নদীটি। এই নদীর নাম নাফ। কয়েক মাইল দক্ষিণে গিয়েই বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। নদীর এপারে বাংলাদেশ, ওপারে মায়ানমার। ওই তো ওপারে সার ধরা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের মাথা গিয়ে ঠেকেছে আকাশে। এখন শেষ বিকেল। কোন ফাঁকে উধাও হয়েছে রোদ, নাফের জলের মতো স্বচ্ছ এক আলো ফুটে আছে চারদিকে। সীমান্ত মানে না এমন কিছু পাখি নাফ অতিক্রম করে মায়ানমার চলে যায়, কিছু পাখি ফিরে আসে বাংলাদেশে। নদীতে প্রচুর জেলে নাও। মাছ ধরতে ধরতে উত্তরে যায় তারা, দক্ষিণে যায়। কিন্তু নদীর মাঝ বরাবর গিয়ে ওপারের দিকে আর এগোয় না। ওপারেরগুলোও এগোয় না এপারের দিকে। নদীর মাঝখানে অদৃশ্য একটা সীমানা আছে। পূর্ব সীমানায় মায়ানমার পশ্চিমে বাংলাদেশ, জেলেরা জানে। এজন্যে কেউ কারও সীমানায় ঢোকে না। ঢুকলে মুহূর্তেই জলপুলিশের কানে যাবে সে কথা। তারা এসে ধরবে।

এসব ভাবতে নদীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আনল রবিন। বাংলোর দিকে তাকাল। বাংলোটা একতলা কিন্তু ভঙ্গিটা দোতলার মতো। টেকনাফে ঢোকার বড় রাস্তার পাশে। গেট দিয়ে ঢোকার পর বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি। একপাশে সার ধরা রুম, অন্যপাশে তিনদিকে রেলিং দেয়া বেশ বড় চৌকো একটা ব্যালকনি। ব্যালকনি ছাড়িয়ে কয়েকগজ দূরে বাউন্ডারি ওয়াল, নদী

থেকে বাংলোকে আড়াল করে রেখেছে। এই ওয়ালের মাঝ বরাবর ঘাটলা। থাক থাক সিঁড়ি নেমে গেছে নাফের জলে। এই নদীতে আছে অদ্ভুত এক জোয়ার ভাটার খেলা। ভোরবেলা ভাটার টানে জল নেমে যায় বহুদূর। আবার বিকেলবেলা টইটম্বুর, ঘাটলার মুখ ছুঁই ছুঁই করে। এখনও করছে।

ভোরবেলা কতদূর নামে জল!

আজ বিকেলেই এখানে এসে পৌঁছেছে বলে নাফের জোয়ার দেখতে পাচ্ছে রবিন, কাল সকালের আগে ভাটা দেখতে পাবে না। রবিন মনে মনে বলল, আমি কাল খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠব। নাফের জল সিঁড়ি ছাড়িয়ে কতদূর নামে দেখব।

সঙ্গে সঙ্গে রবিনের কানের কাছে মুখ এনে ভারি গলায় কে যেন বলল, দেখ।

কেউ যদি কারও কানের কাছে মুখ এনে কথা বলে তার শ্বাস প্রশ্বাসের আঁচ পাওয়া যায়। তেমন কোনও আঁচ কিন্তু রবিন পেল না। শুধু কথা বলার শব্দটুকু।

এবার আগের চে' বেশি চমকাল রবিন। চমকে চারদিকে তাকাল। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। সামনে নিথর হয়ে আছে গাছটি।

আশ্চর্য ব্যাপার তো!

রবিনের গা কাঁটা দিয়ে উঠল। কী রকম ভয় ভয় করতে লাগল। তারপরই মনে হলো ও কিছু না, মনের ভুল। গাছটি ছাড়া সামনে কেউ নেই। কে কথা বলবে! গাছ তো আর কথা বলতে পারে না!

কিন্তু পরপর দুবার একই রকম মনে হলো কেন রবিনের! দুবারই কার যেন ভারি গলা শুনতে পেল সে।

রবিন চিন্তিত হলো।

ঠিক তখনি ছোট মামাকে দেখা গেল তাঁর রুম থেকে বেরিয়ে ব্যালকনির দিকে আসছেন। মুখটা আনন্দে ঝলমল করছে। রবিনের সামনে এসে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। চারদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ গলায় বললেন, 'মারভেলাস জায়গা, ওই যে ওপারে পাহাড় দেখছিস ওটা হচ্ছে বার্মা।'

রবিন গম্ভীর গলায় বলল, 'বার্মা নামে এখন আর কোনও দেশ নেই। এখন বার্মার নাম হচ্ছে মায়ানমার।'

মামা হাসলেন, ঠিক বলেছিস। টেকনাফ থেকে মায়ানমারটা কত কাছে, দেখ। ভাল সাঁতারু হলে নাফ সাঁতরে মায়ানমার চলে যাওয়া যায়।

তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে রবিনের দিকে তাকালেন মামা। 'আচ্ছা, এই জায়গাটার নাম টেকনাফ কেন জানিস?'

রবিন আনমনা গলায় বলল, না।

মামা তীক্ষ্ণচোখে রবিনের মুখের দিকে তাকালেন, এই তোর হয়েছে কী রে?

রবিন হাসল, কী হবে?

আনমনা হয়ে আছিস কেন? কী ভাবছিস?

ব্যাপারটা মামাকে খুলে বলতে চাইল রবিন, কী ভেবে বলল না। কথা ঘুরিয়ে দিল। চটপটে গলায় বলল, টেকনাফ নাম কেন হয়েছে বল।

মামার স্বভাব হচ্ছে কেউ কিছু জানতে চাইলে ভারি খুশি হন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে অন্যসব ভুলে সেই বিষয়ে কথা বলেন। এখনও তাই হলো।

মামা বললেন, টেক শব্দটা আঞ্চলিক। মানে হচ্ছে উঁচু জায়গা। আর নাফ তো নদীটির নাম। অর্থাৎ নাফের উঁচু জায়গা টেকনাফ।

যে কোনও বিষয়ে কথা শেষ করে নিঃশব্দে হাসেন মামা। সেই হাসিতে দাঁত দেখা যায় না তাঁর, শুধু মুখের দুপাশে লম্বা হয়ে যায় ঠোঁট। মামার এই অদ্ভুত হাসি দেখে বরাবরই খুব মজা পায় রবিন। কিন্তু এখন পেল না। তার বার বার মনে পড়ছে সেই ভারি কণ্ঠের কথা। রবিনের খুব কাছে দাঁড়িয়ে কে যেন কথা বলল, একবার নয়, দুবার। দুবারই কি মনের ভুল হয় কারও! শোনার ভুল হয়! রবিনের কান তো খুব পরিষ্কার।

তাহলে?

মামা বললেন, আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল টেকনাফ দেখার। দেখাটা এবার হয়ে যাবে। তোদের সঙ্গে এজন্যেই এখানে আসার চান্সটা নিলাম। আপাকে দুলাভাইকে খুব করে পটালাম, নিয়ে এলো। তোরা তো

তিনদিন পর ঢাকায় ফিরে যাবি। আমি কিন্তু যাব না। আমি বেশ কিছুদিন এখানে থাকব। সেন্টমার্টিন দ্বীপে যাওয়ার একটা চান্স নেব।

রবিন অবাক হয়ে মামার মুখের দিকে তাকাল, সেন্টমার্টিন দ্বীপ তো এখান থেকে অনেক দূর! বঙ্গোপসাগরের মাঝখানে।

মামা হাত তুলে রবিনকে থামালেন। চুপ কর। সেন্টমার্টিন দ্বীপ নিয়ে আমি একটা লেকচার দিচ্ছি, শোন। দুমিনিটে দ্বীপটি সম্পর্কে তোর হেভি জ্ঞান হয়ে যাবে। টেকনাফ থেকে বাইশ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রের একেবারে মাঝখানে সেন্টমার্টিন। ট্রানজিট বোটে করে যেতে আড়াই তিনঘণ্টা লাগে। দ্বীপের লোকেরা নৌকো নিয়েও আসা যাওয়া করে। সাড়ে তিন হাজার লোকের বাস সেন্টমার্টিনে। দ্বীপের আকৃতিটা ডিমের মতো। লম্বায় সাড়ে তিনমাইল, পাশে দেড় মাইল। প্রচুর নারকেল গাছ আছে। সাড়ে তিন হাজার লোকের প্রায় সবাই মৎস্যজীবী। বর্ষায় টেকনাফের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ থাকে না। সমুদ্র তখন ভীষণ উত্তাল। বর্ষার আগে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব টেকনাফ থেকে নিয়ে ঘরে মজুত করে রাখে সেন্টমার্টিনের অধিবাসীরা।

কথা শেষ করে অদ্ভুত সেই হাসিটা হাসতে যাবেন মামা, রবিন বলল, কিন্তু সেন্টমার্টিন সম্পর্কে আসল কথাটাই তুমি বলনি মামা।

মামার হাসিটা মাঝপথে থেমে গেল। মুখটা স্বাভাবিক করে তিনি বললেন, কী কথা?

সেন্টমার্টিন হচ্ছে প্রবাল দ্বীপ। বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ সেন্টমার্টিন যা প্রবাল জমে জমে গড়ে উঠেছে। কত লক্ষ বছর লেগেছে দ্বীপটা গড়ে উঠতে সেই তথ্য এখনও কেউ জানে না।

পট পট করে চোখে দুতিনটে পলক ফেললেন মামা। কিছু একটা বলতে যাবেন তার আগেই খুব কাছ থেকে কে যেন খিক করে একটু হাসল। মামা থতমত খেয়ে গেলেন, হাসছিস কেন রবিনহুড?

হাসির শব্দটা রবিনও শুনেছে। সে ভেবেছে মামা হেসেছেন। কিন্তু এখন মামা তাকে উল্টো প্রশ্ন করছেন শুনে সে বেশ ভড়কে গেল। কাঁচুমাচু গলায় বলল, আমি হাসিনি তো মামা।

তাহলে কে হাসল?

আমি তো ভেবেছি তুমি।

মামা গম্ভীর হয়ে গেলেন, আমার সঙ্গে চালাকি হচ্ছে?

রবিন বলতে চাইল, মামা আমি সত্যি হাসিনি। তুমি বলছ তুমিও হাসনি। তাহলে নিশ্চয় অন্য কেউ হেসেছে। আমাদের দুজনের শোনায় তো আর ভুল হতে পারে না! কিন্তু এখানে তুমি আর আমি ছাড়া কেউ নেই। তাহলে হাসল কে? খানিক আগে আরও দুবার অচেনা ভারি এক গলার কথা শুনেছি আমি, কাউকে দেখতে পাইনি।

কিন্তু কথাগুলো বলতে পারল না রবিন। মনে হলো কে যেন জোর করে তার মুখ চেপে রেখেছে। ভেতরে ভেতরে কথা বলার জন্য আকুলি বিকুলি করছে সে, বলতে পারছে না।

তখুনি গাছটির দিকে চোখ পড়ল মামার। সব ভুলে অবাক হলেন তিনি। রবিনকে বললেন, দেখ দেখ গাছের পাতাগুলো কেমন বদলে গেছে।

রবিন গাছটির দিকে তাকাল। তাকিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। গাছের প্রতিটি পাতা কোন ফাঁকে যেন দুভাঁজ হয়ে আকৃতির অর্ধেক হয়ে গেছে। লজ্জাবতীর পাতা ছুঁয়ে দিলে যেমন হয় ঠিক তেমন।

চারদিকে তখন সন্ধে হচ্ছে। আবছা অন্ধকারে ভরে যাচ্ছে নাফ নদী। অদ্ভুত এক নির্জনতা নামছে বাংলোয়। মামা বললেন, গাছটা বেশ অদ্ভুত। বোধহয় রাতভর ঘুমোয়। এজন্যে পাতাগুলো অমন হয়ে গেছে। গাছেরও অনেক রহস্য থাকে। মানুষ তা জানে না। চল ঘরে যাই। সন্ধেবেলা এক কাপ চা না খেলে মেজাজটা আমার খাট্টা হয়ে যাবে।

ভোররাতে রবিনের মনে হলো মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কে যেন তাকে ডাকছে। রবিনের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙা চোখে চারদিকে তাকাতে লাগল সে।

রুমটা আবছা অন্ধকারে ভরে আছে। পাশাপাশি দুটো খাটে শুয়ে আছে রবিন আর ছোটমামা। মামা লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। রবিনের গায়েও লেপ আছে কিন্তু মাথাটা লেপের ভেতর ঢুকোয়নি সে। মাথা ঢেকে ঘুমোতে পারে না রবিন। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

কিন্তু কে ডাকল রবিনকে!

তখুনি জানালার দিকে চোখ গেল রবিনের। চমকে উঠল। ঘুমোবার আগে রুমের প্রতিটি জানালা নিজ হাতে বন্ধ করেছেন মামা। কই, এখন দেখি একটি খোলা! আর জানালার সামনে ওটা কী?

চোখে দুতিনটে পলক ফেলে, ঘুমভাব কাটিয়ে আবার খোলা জানালার দিকে তাকাল রবিন। তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেল ব্যালকনির সঙ্গের গাছটি তাদের জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই জানালাটি ব্যালকনি থেকে বেশ দূরে এবং বাংলোর পেছনের দিকে। এ কী করে সম্ভব! এটা ওই গাছটাই তো, নাকি অন্য কোনও গাছ!

কিন্তু রবিনের স্পষ্ট মনে আছে বাংলোর পেছন দিকে কোনও গাছ নেই। জানালার সামনে তো নেইই। এখানে আসার পরই, কাল বিকেলে পুরো বাংলো ঘুরে দেখেছে সে। আর গাছটা তো ওই গাছটাই। এখানে এলো কী করে?

ব্যাপারটা বোঝার জন্য বিছানা থেকে নামল রবিন। সঙ্গে সঙ্গে জানালার কাছ থেকে সরে গেল গাছটি।

আশ্চর্য ব্যাপার!

মামাকে ডাকবে নাকি রবিন! বলবে সবকিছু!

না এসময় ডাকলে রেগে যাবেন মামা। রবিনের কোনও কথাই বিশ্বাস করবেন না। তারচে' রবিন নিজেই দেখুক আসলে ব্যাপারটা কী!

নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরুল রবিন।

বাইরে ফিকে হতে শুরু করেছে রাতের অন্ধকার। নিউজপ্রিন্ট কাগজের মতো একটা আলো ফুটে উঠছে। সেই আলোয় রবিন স্পষ্ট দেখল কাল সন্ধ্যায় গাছটা যেখানে ছিল সেখানে নেই। মানুষের মতো আস্তে ধীরে হেঁটে নদীতে নামার সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে সে।

এতটা অবাক জীবনে কখনও হয়নি রবিন। তার মনে হলো দৃশ্যটা বাস্তব নয়, সে আসলে স্বপ্ন দেখছে। বিশাল একটি গাছ হাঁটছে। এ কী করে সম্ভব!

দুহাতে চোখ কচলে ভাল করে তাকাল রবিন। না, দৃশ্যের পরিবর্তন নেই। ওই তো হেঁটে হেঁটে গাছটি একেবারে সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিছু না ভেবে ব্যালকনির দিকে ছুটে গেল রবিন। রেলিং ধরে দাঁড়াল। নাফের জলে এখন ভাটার টান। কাল সন্ধ্যায় জল ছিল সিঁড়ির মুখ ছুঁয়ে। এখন সেই জল নেমে গেছে বহুদূর। ঘাটলার অনেকগুলো সিঁড়ি জেগে উঠেছে। সেই সিঁড়ি বেয়ে আস্তে ধীরে জলের দিকে নেমে যাচ্ছে গাছটি। রবিন ফ্যাল ফ্যাল করে সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে অবিকল মানুষের ভঙ্গিতে একটি ডাইভ দিল গাছটি। জলের তলায় হারিয়ে গেল। অবশ্য সে কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরই দূরে গিয়ে ভেসে উঠল। মানুষের ভঙ্গিতে ডালপালা নেড়ে সাঁতার কাটতে লাগল। বিশাল দুটো ডাল তার মানুষের হাতের কায়দায় ওঠানামা করতে লাগল। গোড়ার দিককার দুটো মোটা শেকড় পায়ের মতো তোলপাড় করতে লাগল নাফের জল। হঠাৎ করে দেখে কেউ বুঝতেই পারবে না এটা একটা গাছ। মনে হবে কোনও মানুষ সাঁতার কেটে গোসল করছে।

রবিন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দৃশ্যটির দিকে। কতটা সময় কেটে গেছে খেয়াল নেই তার। কোথায় দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল নেই। জেগে আছে না ঘুমিয়ে তাও ঠিকঠাক বুঝতে পারছে না।

একসময় মানুষের কায়দায় জল থেকে উঠল গাছটি। সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে জলে ভেজা শিশু যেমন ছটফটে ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে তেমন করে ডালপালা নাড়াতে লাগল। অর্থাৎ গা থেকে ঝরিয়ে দিল জলের প্রতিটি ফোঁটা। তারপর ধীর মন্থর ভঙ্গিতে একটার পর একটা সিঁড়ি টপকে কাল সন্ধ্যায় যেখানে ছিল ঠিক সেখানে এসে দাঁড়াল। গাছের প্রতিটি ডালপালা থেকে অদ্ভুত এক শীতলতা এসে মুখে ঝাপটা দিল রবিনের। সঙ্গে সঙ্গে ঘোর কেটে গেল ওর। হকচকিয়ে গাছটির দিকে তাকাল সে। গাছের প্রতিটি ডালপালা এখন ঝকঝকে তকতকে। পাতাগুলো জলে ধোয়া চকচকে সবুজ। ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে গাছটি। গোসল করার পর মানুষকে যেমন পরিচ্ছন্ন লাগে গাছটি এখন তেমন।

রবিন মুগ্ধ হয়ে গাছটির দিকে তাকিয়ে রইল।

ঠিক তখুনি খুব কাছ থেকে ক্লান্তির একটা শ্বাস ফেলল কেউ। অতিরিক্ত পরিশ্রম করার পর এরকম শ্বাস ফেলে মানুষ।

রবিন চমকে উঠল। কে শ্বাস ফেলল অমন করে!

কিন্তু চারদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না রবিন। শুধু গাছটি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

তাহলে কি গাছটিই শ্বাস ফেলেছে! নাফের জলে নেমে এতক্ষণ সাঁতার কাটার ফলে ক্লান্ত হয়েছে সে! সাঁতার কাটলে তো খুবই ক্লান্তি লাগে মানুষের। গাছেরও কি লাগে! না লাগলে অমন করে শ্বাস ফেলল কেন গাছটি!

এই ধরনের পরিস্থিতিতে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা মানুষের। রবিন কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় পেল না। বরং বেশ মজা লাগছে। মনে হচ্ছে বেশ মজার একটা খেলা পেয়ে গেছে সে। এই খেলার আনন্দ সে ছাড়া অন্য কেউ উপভোগ করতে পারছে না।

অবশ্য খেলা অন্যের সঙ্গে উপভোগ করতে না পারলে মজা নেই। একা একা কোনও খেলাই মনমতো উপভোগ করা যায় না।

গাছটির কথা কি ছোট মামাকে বলবে রবিন!

ভোররাত থেকে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বলবে!

সঙ্গে সঙ্গে রবিনের কানের কাছে মুখ এনে কেউ বলল, না বলো না।

রবিন আবার চমকাল। আবার চারদিকে তাকাল। কিন্তু কোথাও কেউ নেই।

এই প্রথম রবিন বুঝে গেল কথা আসলে গাছটিই বলছে। কাল একবার খিক করে হেসেছে। আজ খানিক আগে ক্লান্তির শ্বাস ফেলেছে। সবকিছুই করছে এই গাছ।

কিন্তু রবিনের মনে মনে বলা কথা কী করে শুনছে গাছটি! টুকটাক যা দুয়েকটি কথা গাছটি বলছে তা তো শব্দ করে বলছে। রবিন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

সে ঠিক করল মনে মনে কিছু প্রশ্ন এখন গাছটিকে করবে। উত্তর পেলে বুঝে ফেলবে কথা আসলে গাছটিই বলছে।

রবিন মনে মনে বলল, মাঝে মাঝে কে এখানে কথা বলে? তুমি?

কোনও উত্তর এলো না।

রবিন ভাবল গাছটি হয়তো আনমনা হয়ে আছে, তার কথা শুনতে পায়নি। সে আবার বলল, কাল সন্ধ্যায়ও শুনলাম আজও শুনলাম, কে কথা বলে! একবার খিক করে হাসল। হাসিটা আমি এবং ছোট মামা দুজনেই শুনলাম। তুমি হেসেছ? খানিক আগে যে ক্লান্তির শ্বাস ফেলল সে কি তুমি?

কেউ কোনও সাড়া দিল না।

রবিনের মনে হলো মনে মনে বলা কথা হয়তো শুনতে পায় না গাছটি, শব্দ করে বলা কথা হয়তো শুনতে পায়। গাছটির দিকে তাকিয়ে শব্দ করে বলে গেল কিন্তু কেউ কোনও সাড়া দিল না। রবিন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

আশ্চর্য ব্যাপার! কোনও ধারণাই ঠিকঠাক মিলছে না। হচ্ছে কী এসব! রবিনের খুব হাসি পেল। গাছটির দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগল সে।

ছোট মামার আজ ঘুম ভেঙেছে সকালে। লেপের ভেতর থেকে মুখ বের করে প্রথমেই তিনি তাকিয়েছেন রবিনের বিছানার দিকে। তাকিয়ে অবাক হয়েছেন। রবিন বিছানায় নেই! কোথায় গেল এত সকালে! বিছানায় শুয়ে থেকেই দরজার দিকে তাকিয়েছেন ছোটমামা। দরজাটা খোলা। পূর্ব আকাশে বুঝি এইমাত্র উঁকি দিয়েছে সূর্য। রোদেলা একটা ভাব এসে পড়েছে দরজার সামনে। বিছানায় উঠে বসলেন ছোটমামা। একা একাই বিড়বিড় করে বললেন, 'যাহ বাবা রোদ উঠে গেল। ভাবলাম রোদ ওঠার আগেই বেরুব। হলো না।

নিজের মাথায় নিজেরই একটা চাঁটি মারতে ইচ্ছে হলো তাঁর। কোনওদিনও সময়মতো ঘুম ভাঙে না আমার। সময়মতো ঘুম না ভাঙলে কি কাজ হয়! ঘুমের কারণে সব প্ল্যান নষ্ট হয়ে যায়। আজকেরটাও গেল। তারচে' রবিনকে বলে রাখলেই হোত। রবিন ডেকে দিত। সে তো দেখি আমার অনেক আগে উঠেছে।

কিন্তু রবিনটা গেল কোথায়?

বিছানা থেকে নেমে খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন ছোটমামা।

ব্যালকনিতে রবিনকে দেখতে পেলেন সেই গাছটির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কথা বলছে। কী বলছে এতটা দূর থেকে শুনতে পেলেন না ছোটমামা। তবে তিনি যারপরনাই অবাক হলেন। রবিনটার হয়েছে কী! টেকনাফে এসে পাগল হয়ে গেল নাকি! গাছের সঙ্গে কথা বলছে!

ছোটমামা তীক্ষ্ণচোখে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সাড়া দিলেন না, নড়লেন না।

নাফের ওপারে, মায়ানমার পাহাড়ের পিঠ বেয়ে সূর্য তখন মাত্র উঠে এসেছে। সকালবেলার কাঁচা রোদ এসে পড়েছে পাহাড়চুড়োয় নাফের কোমল জলে বাংলোর বারান্দায় এবং গাছের পাতায়। সূর্যের আলোয় চারদিক যেন নিঃশব্দে হাসছে। ঠিক তখুনি রবিনকে দেখা গেল কথা শেষ করে গাছটির দিকে তাকিয়ে হাসছে।

ছোটমামা আর সহ্য করতে পারলেন না। বেশ রাশভারি ভঙ্গিতে রবিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হাসি বন্ধ করে মামার মুখের দিকে তাকাল রবিন। ঘুম ভাঙল?

মামা গম্ভীর গলায় বললেন, ভাঙল নয় ভেঙেছে।

কখন?

অনেক আগে।

রবিন খুবই অবাক হলো। তুমি তাহলে দেখেছ?

মামা আগের মতোই গম্ভীর গলায় বললেন, দেখেছি।

শ্বাস ফেলার শব্দ শুনেছ?

না।

কথা বলা?

শুনিনি। দেখেছি।

তারপর ডান হাতের বুড়ো আঙুলের পাশের আঙুলটি দিয়ে রবিনের পেটের কাছে একটি খোঁচা মেরে বললেন, হাসতেও দেখেছি।

কিন্তু গাছটি তো আজ হাসেনি।

মানে? গাছ হাসবে কেন! কী রে রবিনহুড, টেকনাফে এসে পাগল হয়ে গেছিস নাকি! আরে আমি তো তোকে হাসতে দেখলাম! তোকে দেখলাম গাছের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কথা বলছিস! তোর হয়েছে কী!

রবিন বুঝে গেল গাছটির নদীতে নেমে গোসল করা ইত্যাদি কিছুই দেখেননি ছোটমামা। তিনি দেখেছেন রবিনকে গাছের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে, হাসতে। তার মানে মামা উঠেছেন রবিনের ঘাম ভাঙার অনেক পরে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। মামাকে কি তাহলে পুরো ঘটনাটা এখন বলবে

রবিন? ভোররাত থেকে খানিক আগ পর্যন্ত যা যা ঘটে গেছে? খানিক আগেও এরকম একবার ভেবেছিল রবিন। তখন কানের কাছে মুখ এনে কে যেন তাকে মানা করেছে।

থাক। বলবার দরকার নেই। বললেও তো ছোটমামা এসব বিশ্বেস করবেন না। হাসবেন। রবিনকে বলবেন পাগল। শুনতে ভাল লাগবে না। ছোটমামা বললেন, এই রবিনহুড তোর যখন ঘুম ভাঙল আমাকে ডাকলি না কেন?

রবিন বলল, একবার ডাকতে চেয়েছিলাম।

তারপর?

তোমার ভয়ে ডাকিনি।

কীসের ভয়?

ডাকলে তুমি যদি রেগে যাও?

রেগে তো যেতামই। এটা আমার স্বভাব। ঘুম থেকে ডাকলে রেগে যাই।

তাহলে?

তারপরও তোর ওপর খুশি হতাম।

কেন?

এখানে এসে কাল বিকেলেই ঠিক করেছি আজ খুব সকালে সূর্য ওঠার আগে সমুদ্রতীরে যাব। সী বিচে। একজন রিকশাঅলাও ঠিক করে রেখেছি। সে এসে নিয়ে যাবে।

তারপরই যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে ছোটমামা বললেন, কিন্তু রিকশাঅলাটা আসেনি? তার তো এসে আমাকে ডাকার কথা।

বাংলোর কেয়ারটেকার মঙ্গলকে দেখা গেল চা নাশতার ট্রে নিয়ে ড্রয়িংরুমের দিকে যাচ্ছে। ছোটমামা চিৎকার করে মঙ্গলকে ডাকলেন, মঙ্গল পাণ্ডে শোন শোন।

মঙ্গল নামটির সঙ্গে কেন পাণ্ডে কথাটি জুড়ে দিলেন মামা বুঝতে পারল না রবিন। মামার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওর নাম তো মঙ্গল। তুমি মঙ্গল পাণ্ডে বলছ কেন? পাণ্ডে পেলে কোথায়?

মামা তার বিখ্যাত হাসিটি হাসলেন। নিঃশব্দে ঠোঁট সরু করে ছড়িয়ে দিলেন মুখের দুপাশে।

মঙ্গল এসে সামনে দাঁড়াল, জ্বি সাহেব।

মামা বললেন, একজন রিকশাঅলাকে আসতে বলেছিলাম। আমাকে নিয়ে সী বিচে যাবে। আসেনি? তোমাদের টেকনাফের রিকশাঅলারা তো দেখি মহা ত্যাঁদড়।

মঙ্গল বিনীত গলায় বলল, জ্বি না সাহেব ত্যাঁদড় না।

তাহলে আসেনি কেন?

আসছে তো।

যতটা রাগী গলায় কথা বলছিলেন মামা, রিকশাঅলা এসেছে শুনে ততটাই নেমে গেল তাঁর গলা। এসেছে? কোথায়?

গেটের বাইরে রিকশা নিয়া বসে আছে।

কখন এসেছে? আমাকে ডাকার কথা ছিল, ডাকেনি কেন?

আমি মানা করেছি।

কেন?

সাহেব, বেগম সাহেব দুইজনেই মানা করেছেন।

আপা, দুলাভাই মানা করেছেন। কেন?

বললেন, ডাকলে আপনি রেগে যাবেন। এজন্যেই ডাকিনি।

রিকশাঅলা চলে গেছে?

না এখনও বইসা আছে।

তাহলে এখনই যাব।

রবিন অবাক গলায় বলল, কোথায়?

সী বিচে।

আমাকে নেবে?

চোখ সরু করে সামান্য সময় কী ভাবলেন ছোটমামা। তারপর বললেন, চল।

মঙ্গল বলল, নাশতা কইরা যান সাহেব। সব রেডি।

মামা বললেন, ঠিক আছে তাহলে নাশতা করেই বেরুব। তুমি যাও। নাশতা লাগাও।

মঙ্গল চলে গেল।

মামা বললেন, এবার তোর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। মঙ্গল নামটি আমার কাছে ইনকমপ্লিট মানে অসম্পূর্ণ মনে হয়। পাণ্ডে লাগিয়ে দেয়ায় কমপ্লিট হয়েছে। এখন বেশ একটা নাম মনে হয়।

হঠাৎ করে পাণ্ডে কথাটা পেলে কোথায়?

মামা আবার সেই হাসিটা হাসলেন। বানিয়েছি। এসব বানাতে আমার সময় লাগে না। আমি খুবই প্রতিভাবান লোক।

কিন্তু পাণ্ডে কথাটার মানে কী?

মামা নির্বিকার গলায় বললেন, মানে হচ্ছে গুণ্ডাপাণ্ডা। পাণ্ডা নামে অবশ্য চীনদেশেও একটি জীব আছে। খুবই হোতকা ধরনের। তুই ধরে নিতে পারিস পাণ্ডেটা আমি সেই পাণ্ডা থেকেই নিয়েছি। প্রতিভা থাকলে যা হয় আর কি!

মামার কথা শুনে হাসি পাওয়ার কথা রবিনের কিন্তু হাসল না সে।

ছোটমামার পিছু পিছু বাংলো থেকে বেরুচ্ছে রবিন, হঠাৎ চোখ পড়ল গাছটির দিকে। দেখতে পেল গাছটির দুটো বড় ডালের একটি অবিকল মানুষের হাতের মতো নড়ছে। নড়ার ভঙ্গিটি এমন যেন রবিনকে ছোটমামার সঙ্গে যেতে মানা করছে। শব্দ না করে ইশারায় নিষেধ করার মতো।

দেখে রবিনের বুকটা একটু কেঁপে উঠল। গাছটি কি তাহলে ছোটমামার সঙ্গে সী বিচে যেতে নিষেধ করছে রবিনকে! কেন?

সী বিচে গেলে কী হবে?

নিজের অজান্তেই পা থেমে গেল রবিনের।

ছোটমামা ততক্ষণে রিকশায় উঠে বসেছেন। চিৎকার করে রবিনকে ডাকলেন, কী হলো রে রবিনহুড? যাবি না?

রবিন আর গাছটির দিকে তাকাল না। দ্রুত হেঁটে গেটের বাইরে গেল। ছোটমামার পাশে রিকশায় উঠে বসল। সারাটা পথ মন কেমন ভার হয়ে রইল রবিনের।

কিন্তু সী বিচের কাছাকাছি এসে আনন্দে মন নেচে উঠল তার। হা হা হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসছে সমুদ্রের গর্জন। শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ। শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতর কেমন করে উঠল রবিনের। মনে হলো এ আসলে সমুদ্রের গর্জন নয় সমুদ্র যেন তাকে ডাকছে। আয় আয়।

তারপরই বোটকা একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল। নাক চেপে ধরে ছোটমামার দিকে তাকাল সে। মামারও একই অবস্থা। নাক চেপে ধরেছেন। রবিন তাঁর দিকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এহহে গন্ধে তো নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসছে। ও রিকশাঅলা, কী মরেছে ভাই? গরু না খাটাস?

রিকশাঅলা বলল, কিছু মরে নাই সাহেব। শুঁটকি মাছের গন্ধ।

এত পচা গন্ধ। এই জিনিস মানুষ খায় কী করে?

নাক থেকে হাত সরিয়ে রবিন বলল, অন্যের কথা বলছ কেন মামা, তুমিই তো শুঁটকি মাছ খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাও। বাড়িতে যেদিন শুঁটকি রান্না হয় সেদিন তুমি অন্য কিছু খাও না।

রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে রিকশা সেখানে এসে থামল। ছোটমামা বললেন, তুমি বসে থাক। আমরা ঘুরে এসে তোমার রিকশায় করেই বাংলোতে ফিরব।

রিকশাঅলা কথা বলল না। নীরবে মাথা নাড়ল।

রবিন তখন মুগ্ধচোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। শোঁ শোঁ শব্দে বরফের মতো সাদা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বালিয়াড়িতে। দূরে সমুদ্রের মাঝখানে এসে নেমেছে আকাশি রঙের আকাশ। তীরের অদূরে উড়োউড়ি করছে অজস্র সমুদ্র পাখি। ঘের জাল টেনে টেনে মাছ ধরছে জেলেরা। ছোট ছোট সাম্পানের মতো জেলে নাও আছে অনেক। রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে তার দুপাশে লম্বা বাঁশের মাচানে শুঁটকি দেয়া হয়েছে মাছ। বোটকা গন্ধে ভারি হয়ে আছে সেখানকার বাতাস। কাক চিল উড়োউড়ি করছে। কিন্তু রবিন কোনওদিকে ফিরে তাকাল না। দ্রুত পায়ে সমুদ্রের দিকে হাঁটতে লাগল সে। সমুদ্রতীরের গম্ভীর বালিতে পা ডুবে যায় রবিনের, রবিন খেয়াল করে না। জলের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

এখন ভাটার সময়। জলের টানে জল নেমে গেছে বহুদূর। তীরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অজস্র জেলিফিশ। জোয়ারের সময় এসে বালিয়াড়িতে আটকা পড়েছে আর নামতে পারেনি। মরে পড়ে আছে বালির ওপর। অনেকগুলো পলিথিনের শপিং ব্যাগে জল ভরে একত্রে গিঁট দিয়ে কোথাও ফেলে রাখলে যেমন দেখাবে জেলিফিশগুলোকে ঠিক তেমন দেখাচ্ছে।

পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটি জেলিফিশ মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল রবিন। ছোটমামা বললেন, বল তো এটা কী?

সঙ্গে সঙ্গে একটি ঢেউ এসে হাঁটু অবধি ভিজিয়ে দিল রবিনের। মামার প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না সে। লাফ দিয়ে উঠল। তারপর হি হি করে হাসতে লাগল।

মামা বললেন, হাসছিস কেন?

রবিন হাসতে হাসতে বলল, সমুদ্রের পানিতে ভিজে গেছি। আমার খুব মজা লাগছে মামা। চল গোসল করি।

মামা ভয়ে সিটকে গেলেন। আমি সাঁতার জানি না।

আমিও তো জানি না।

তাহলে?

সাঁতার না জানলে সমুদ্রে গোসল করা যায়। সমুদ্রের অর্ধেক পর্যন্ত চলে যাবে দেখবে তোমার বুক সমান পানি। ইচ্ছে করলেও ডুবে যেতে পারবে না তুমি।

রবিনের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঁচু হয়ে বিশাল এক ঢেউ এলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই রবিন টের পেল অতিকায় এক থাবায় কেউ যেন আঁকড়ে ধরল তার দুটো পা। তারপর হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। জলের ভেতর গড়াগড়ি খেতে খেতে ক্রমশ তলিয়ে যেতে লাগল রবিন। নাক মুখ দিয়ে অবিরাম ঢুকছে তার সমুদ্রের লোনা জল।

সম্পূর্ণ তলিয়ে যাওয়ার আগে মুহূর্তের জন্য একবার ভেসে উঠল রবিন। সেই ফাঁকে আর্তচিৎকারে বুক ফাটাচ্ছেন ছোটমামা। রবিন সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। রবিন সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। তোমরা কে কোথায় আছ রবিনকে বাঁচাও। রবিনকে বাঁচাও।

জলের তলায় রবিন তখন ক্রমশ নেমে যাচ্ছে গভীর সমুদ্রে।

রবিনের মনে হলো গভীর ঘুমে আছে সে আর তার মাথায় পিঠে আলতো করে হাত বুলিয়ে সেই ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করছে কেউ। ফাল্গুন মাসের শেষ দিককার কোনও কোনও সকাল যেমন হয়, না শীত না গরম এমন একটা ভাব চারদিকে। এরকম পরিবেশে ঘুমিয়ে থাকলে কার ইচ্ছে করে চোখ খুলতে!

রবিনেরও ইচ্ছে করছিল না।

কিন্তু না খুলে উপায় কী! কে যেন অবিরাম হাত বুলাচ্ছে মাথায় পিঠে। রবিন চোখ খুলল। খুলে অবাক হয়ে গেল। তার তিনদিকে নীলাভ কাচের মতো ঝকঝকে স্বচ্ছ জল। পিঠের তলায় নরম ফোমের মতো একখানা বিছানা। রবিন শুয়ে আছে জলের অনেক তলায়। এতক্ষণ গভীর ঘুমে ছিল, এইমাত্র কেউ তার ঘুম ভাঙিয়েছে।

কিন্তু জলের তলায় এভাবে কেমন করে ঘুমিয়ে থাকে মানুষ! শ্বাস প্রশ্বাস নেয় কী করে! ব্যাপারটা কি সত্য নাকি স্বপ্ন! স্বপ্ন দেখছে না তো রবিন! নিজের গালে মুখে হাত বুলাল রবিন। দুহাতে চোখ কচলাল। না স্বপ্ন নয়, সত্য। সত্যি সত্যি গভীর জলের তলায় ফোমের মতো নরম এক বিছানায় শুয়ে আছে সে। তার ডানদিকে জল, বাঁ দিকে জল, ওপরে জল, কেবল পিঠের তলায় নরম বিছানা। বেশ জোরে দুতিনবার শ্বাস টানল রবিন। শ্বাস টানার সময় ভাবল এক্ষুনি শ্বাসের সঙ্গে নাক দিয়ে গলগল করে ঢুকবে জল। আশ্চর্য ব্যাপার, এক ফোঁটা জলও ঢুকল না। ডাঙায় থাকলে যেমন হয়, নিজের রুমে ঘুমিয়ে থাকলে যেমন হয় অবস্থাটা ঠিক তেমন।

এ কী করে সম্ভব!

রবিন শুয়ে থেকেই ডুব সাঁতারের ভঙ্গিতে হাত পা নাড়াতে লাগল। তাতেও মনে হলো না তার চারপাশে জল। মনে হলো হাওয়ায় পা দোলালে যেমন লাগে তেমন লাগছে তার। অথচ রবিনের স্পষ্ট মনে আছে ছোটমামার সঙ্গে টেকনাফের সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসেছিল সে, এসে সমুদ্রে ডুবে গেছে।

সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার পর কেমন করে বেঁচে থাকে মানুষ! কিন্তু রবিন তো দিব্যি বেঁচে আছে। দিব্যি শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে। এইমাত্র চমৎকার একটি ঘুম দিয়ে উঠল।

তারপরই রবিনের মনে হলো ডুবে যাওয়ার সময় নাক মুখ দিয়ে গল গল করে সমুদ্রের লোনা জল ঢুকেছিল। পেটটা ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল। কই এখন তো তা মনে হচ্ছে না। পেট তো তার ঠিকই আছে। সব সময় যেমন থাকে তেমন।

তাহলে!

এসব ভেবে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল রবিন। নেমে অবাক হয়ে গেল। তার পায়ের তলায় জল নেই। সমুদ্রতীরের মতো বালি। আর যে বিছানায় সে শুয়ে ছিল, যে বিছানাকে তার মনে হয়েছিল নরম ফোমের, সেটি আসলে কোনও বিছানা নয়। বিছানা আকৃতির একটি শৈবাল। হালকা সবুজ রঙের।

রবিন ফ্যাল ফ্যাল করে শৈবালটির দিকে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে রবিনের ঘুম ভাঙাল কে?

ঠিক তখুনি নীল রঙের বিশাল একটি ডলফিন আস্তে ধীরে এগিয়ে এলো রবিনের কাছে। রবিনের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ডান বাহুর কাছে ডলফিনটির স্পর্শ টের পেয়েছিল সে।

তাহলে কি ডলফিনটিই ডেকে ডেকে তার ঘুম ভাঙল!

কিন্তু গভীর সমুদ্রের তলায় এরকম অতিকায় এক নীল ডলফিন দাঁড়িয়ে আছে রবিনের গা ঘেঁষে রবিন ভয় পাচ্ছে না কেন?

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডলফিনটা একটু নড়ে উঠল। লেজের দিকটা মৃদু নাড়িয়ে কী রকম আমুদে একটা ভাব প্রকাশ করল। কিছু যেন বলতে চাইল রবিনকে।

ডলফিনটি কি কথা বলতে পারে? ভূতগাছ যেমন পারে?

নীল ডলফিনের চোখের দিকে তাকাল রবিন। পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলল, তুমি কি কথা বলতে পার?

শিশুর ভঙ্গিতে দুদিকে মাথা নাড়ল ডলফিন।

রবিন অবাক হলো। তার মানে বুঝতে পার?

ডলফিন হ্যাঁসূচক মাথা নাড়ল।

রবিন বলল, 'কিন্তু ইশারায় সব কথা তো তোমার কাছ থেকে আমি জানতে পারব না। অনেক কথা জানতে হবে আমায়।

দুদিকে মুখ ছাড়িয়ে হাসল ডলফিন। তারপর লেজের একটি অংশ কলমের মতো বাঁকিয়ে রবিনের পায়ের কাছে বালির ওপর গুটি গুটি করে কী লিখল। রবিন অবাক হয়ে লেখাটির দিকে তাকাল। পরিষ্কার বাংলায় লেখা হয়েছে, আমি কথা বলতে পারি না। লিখতে পারি।

লেখাটি পড়ে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল রবিন। সত্যি?

নীল ডলফিন সঙ্গে সঙ্গে লেজের একটি অংশ কলমের মতো করে লিখল, সত্যি।

তাহলে তো বেশ মজা। আমি মুখে বলব তুমি লিখে উত্তর দেবে।

ডলফিন সঙ্গে সঙ্গে লিখল, আচ্ছা।

তোমার নাম কী?

নীল ডলফিন।

তুমি যে ডলফিন এবং তোমার রঙ যে নীল এ তো যে কেউ দেখে বুঝতে পারবে। নাম না বললেও যে কেউ তোমাকে নীল ডলফিনই বলবে।

ডলফিন নিঃশব্দে হাসল তারপর লিখল, ডলফিনরা নীল রঙের হয় না। কোনও কোনও তিমি হয়। তাদেরকে বলে নীল তিমি। ডলফিন হয়েও আমার রঙ যেহেতু নীল হয়েছে সুতরাং নীল তিমির মতো আমি হয়ে গেছি নীল ডলফিন।

ডলফিন না বললেও চলে। তুমি তোমার নাম শুধু নীল বললেই পার!

তোমাদের মধ্যে কোনও মানুষ যদি নীল হয় তাকে কি কেউ শুধু নীল বলে ডাকবে? তাকে কি সবাই নীল মানুষ বলবে না?

রবিন মাথা নাড়ল। ঠিক তাই। তাকে সবাই নীল মানুষই বলবে।

আমার ব্যাপারটিও হয়েছে তাই।

তুমি বাংলা লিখতে শিখলে কোথায়?

একজন বাঙালি নাবিকের কাছে।

তাকে তুমি কোথায় পেলে?

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি।

অতদূর কেন গিয়েছিলে?

বেড়াতে। আমি বেড়াতে খুব ভালবাসি। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি হঠাৎ দেখি একটি জাহাজডুবি হলো। সেই জাহাজের একজন বাঙালি নাবিক জলের তলা দিয়ে ভেসে যাচ্ছে দেখে আমি তাকে আমার আস্তানায় নিয়ে আসি। আমাদের পৃথিবীর দুতিন মাসের মতো সময় সে আমার কাছে ছিল। সেই সময় বাংলা লেখাটা সে আমায় শিখিয়েছে। চেয়েছিল কথা শেখাতে কিন্তু আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরয় না বলে কথা সে আমায় শেখাতে পারেনি।

নীল ডলফিনের অনেক কথাই বুঝতে পারল না রবিন। ডলফিনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাদের পৃথিবী মানে কী?

জলের তলার পৃথিবী। সমুদ্রতলার পৃথিবী।

স্থল পৃথিবীর সঙ্গে এই পৃথিবীর ব্যবধান কী?

প্রধান ব্যবধান সময়ের। তোমাদের পৃথিবীর কয়েক মিনিট আর আমাদের পৃথিবীর কয়েক মাস সমান।

আমি তাহলে কমাস ধরে তোমাদের এখানে আছি? কমাস ঘুমিয়েছি, কমাস জেগে?

তুমি চলে যাওয়ার সময় তোমাকে আমি সে কথা বলে দেব।

তোমার কথায় বোঝা যাচ্ছে সেই নাবিক আমাদের পৃথিবীর হিসেবে কয়েক মিনিট মাত্র তোমার আশ্রয়ে ছিল, অতটুকু সময়ের মধ্যে বাংলার মতো একটি জটিল ভাষা এত সুন্দরভাবে কেমন করে লিখতে শিখলে তুমি?

জলের তলার কোনও কোনও প্রাণী খুব মেধাবী হয়। মানুষের যা শিখতে বছরের পর বছর চলে যায় তারা মুহূর্তে শিখে ফেলে এবং একবার শিখলে কখনও তা ভোলে না।

সেই নাবিককে তুমি তারপর ফিরিয়ে দিয়ে এসেছিলে?

হ্যাঁ।

কোথায়?

আন্দামানেরই ছোট একটি দ্বীপের কাছে। সেখানে জনবসতি ছিল।

নাবিক কি বেঁচে ছিলেন?

হ্যাঁ। আমার সঙ্গে কোনও মানুষের দেখা হলে, জলের যত তলায়ই চলে যাক সে, তাকে আমি কখনও মরতে দিই না।

তার মানে আমি বেঁচে আছি?

নিশ্চয়।

কেমন করে? এভাবে জলে ডুবে যাওয়ার পর কেমন করে বেঁচে থাকে মানুষ? তাছাড়া টেকনাফের সমুদ্রতীরে হাঁটুঅব্দি জলের তলায় ওরকম বিশাল থাবায় কে আমার পা চেপে ধরল? কে টেনে আনল সমুদ্রতলায়? তুমি আমাকে কেমন করে পেলে?

নিঃশব্দে হেসে ডলফিন লিখল, দাঁড়াও বলছি।

নীল ডলফিন তারপর হঠাৎ করে কেমন বদলে গেল। এতক্ষণে তার আচার আচরণ ছিল ধীর স্থির স্বভাবের মানুষের মতো। চিন্তাশীল, উদাস প্রকৃতির। রবিনের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, তারপর লেজের একটি অংশ কলমের মতো করে রবিনের পায়ের কাছে সে কথার উত্তর লিখছিল। এই প্রথম দেখা গেল মাছের মতো চঞ্চল হয়ে গেছে সে। প্রথমে মুখ উঁচিয়ে, কান খাড়া করে কিছু একটা যেন শোনার চেষ্টা করল। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। সেই ফাঁকে রবিন জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

এই প্রথম রবিনের প্রশ্নের উত্তর লিখল না ডলফিন। শিশুর মতো উচ্ছল ভঙ্গিতে দুতিনটে ডিগবাজি খেল। মুখটা হাসি হাসি, চোখ দুটো চকচক করছে, যেন গভীর আনন্দে ফেটে পড়ছে সে। রবিন খুবই অবাক হয়েছে। এরকম গম্ভীর স্বভাবের একটি ডলফিন হঠাৎ করে এমন উচ্ছল হয়ে গেল কেন? কী ব্যাপার?

রবিন আবার জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

এবার ডিগবাজি বন্ধ করল নীল ডলফিন। তবে মুখটা হাসি হাসি তার, চোখ দুটো আগের মতোই চক চক করছে। চঞ্চল ভঙ্গিতে রবিনের পায়ের কাছে সে লিখল, ডলফিন না হয়ে আমি যদি তিমি হতাম খুব ভাল হতো।

রবিন ভুরু কুঁচকে বলল, কেন? ডলফিনের অসুবিধা কী?

অসুবিধা আছে। ডলফিনরা গান গাইতে পারে না।

তিমিরা পারে?

পারে।

বল কী?

সত্যি। এবং তিমিদের গান তোমাদের পৃথিবীর মানুষ রেকর্ড করেছে। সমুদ্রতলার সবচে' বড় প্রাণী তিমি গান গাইতে পারে এবং মানুষ সেই গান রেকর্ড করেছে মানুষ হয়ে রবিন তা জানে না, জানে সমুদ্রতলার আরেক প্রাণী ডলফিন! অদ্ভুত ব্যাপার। ফ্যাল ফ্যাল করে নীল ডলফিনের দিকে তাকিয়ে রইল রবিন। ডলফিন লিখল, তুমি খুব অবাক হয়েছ, না? অবাক হওয়ার কিছু নেই। ঘটনাটা সত্য। তিমিরা সত্যি গান গাইতে পারে এবং মানুষ তা রেকর্ড করেছে। গভীর সমুদ্রে দল বেঁধে বেড়ায় তিমি। শিশুর মতো হুটোপুটি করে। জলের ওপর মুখ তুলে নিজেদের ভাষায় গান গায়। সেই গানের সুর মানুষের মতো নয়, মানুষের তৈরি কোনও কোনও যন্ত্রসঙ্গীতের মতো।

রবিন তবু কোনও কথা বলল না। আগের মতোই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল নীল ডলফিনের দিকে।

রবিনকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ডলফিনও বেশ অবাক হলো। দুতিন পলক রবিনের মুখের দিকে তাকিয়ে অতি দ্রুত সে লিখল, কী হলো রবিন? প্রশ্ন করছ না যে!

এবার ঝিম ধরা ভাবটা কেটে গেল রবিনের। হাসি হাসিমুখ করে বলল, কী প্রশ্ন করব?

আমি ডলফিন না হয়ে তিমি হতে চাইছি কেন? গান গাইতে চাইছি কেন?

কেন চাইছ?

তার আগে আর একটা কথা বলে রাখি। তিমিরা যে গান গাইতে পারে মানুষ যে সে গান রেকর্ড করেছে এ বিষয়ে তুমি সাইফুদ্দিনকে জিজ্ঞেস কর। সে তোমাকে সব খুলে বলবে। এ বিষয়ে সে সব জানে।

সাইফুদ্দিন কে?

তোমার ছোটমামা। সাইফুদ্দিন আহমেদ।

ছোটমামার নাম যে সাইফুদ্দিন আহমেদ এ কথা ভুলেই গিয়েছিল রবিন। ছোটমামার যে ছোটমামা ছাড়া আর কোনও নাম থাকতে পারে এ কথা মনেই আসে না রবিনের।

কিন্তু ছোটমামার নাম নীল ডলফিন জানল কী করে?

রবিন প্রশ্নটা করবে তার আগেই ডলফিন লিখল, তুমি খুব অবাক হচ্ছ, ভাবছ আমি কী করে তোমার ছোটমামার নাম জানলাম। অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি অনেক কিছু জানি। তোমার ছোটমামা সম্পর্কে এমন একটি তথ্য জানি যা তোমাদের ফ্যামিলির তিনজন মাত্র মানুষ জানে। মহিউদ্দিন মানে তোমার বড়মামা। তিনি এখন সুইডেনে থাকেন। আর জানেন সাহানা মানে তোমার মা এবং ছোটমামা নিজে। এই তিনজনের যে কোনও একজনকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

বড়মামা এবং মার নামও ডলফিনটি জানে! আশ্চর্য ব্যাপার। তবে এ বিষয়ে রবিন আর প্রশ্ন করল না। ছোটমামা বিষয়ক তথ্যটি জানতে চাইল।

ডলফিন লিখল, তোমার নানা সদরুদ্দিন সাহেব তোমার ছোটমামাকে মাঝে মাঝে আদর করে মাউরা বলে ডাকতেন।

এবার আর প্রশ্ন না করে পারল না রবিন। এতসব তুমি জানলে কী করে?

আগে জানতাম না। আজই জেনেছি। খানিক আগে জেনেছি। ওই যে আমি যখন আনমনা ভঙ্গিতে মুখ উঁচিয়ে ছিলাম, কান খাড়া করছিলাম তখন আমার মনের ভেতর থেকে কে যেন এসব কথা বলে দিচ্ছিল। এজন্যই তো আনন্দে অমন ছটফট করছিলাম আমি। তিমি হয়ে যেতে চেয়েছিলাম, গান গাইতে চেয়েছিলাম। আনন্দে থাকলে মানুষ এবং তিমি যেভাবে গান গায় ঠিক সেভাবে।

তাহলে মানুষ হতে চাইলে পারতে! তিমি হতে চাইলে কেন?

মানুষ হওয়া আমি পছন্দ করি না। মানুষের নিয়ম কানুনগুলো আমার ভাল লাগে না। মানুষ এক ধরনের পরাধীন জীব, বোকা জীব।

বল কী! মানুষকে তো বলা হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব।

শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হতে পারে কিন্তু তারা পরাধীন।

কেমন?

মানুষের এটা করা নিষেধ, ওটা করা নিষেধ। এক দেশের মানুষ ইচ্ছে করলেই আরেক দেশে যেতে পারে না। মানুষের রাজনীতি, মানুষের আইন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাদের পায়ে এক ধরনের শিকল পরিয়ে রাখে, সেই শেকলটার নাম পরাধীনতা। সমুদ্রতলার জীবের কোনও রাজনীতি নেই, আইন নেই। ইচ্ছে করলেই এক সমুদ্র থেকে আরেক সমুদ্রে চলে যেতে পারে তারা। এক দেশের জলসীমা অতিক্রম করে যেতে পারে আরেক দেশের জলসীমায়। মানুষ হয়ে এই স্বাধীনতা হারাতে চাই না আমি। কারণ আমি ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি। আর মানুষদের মধ্যে আছে প্রচণ্ড কুটিলতা। অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। সেসব না দিয়ে আমি শুধু একটি উদাহরণ দিচ্ছি, না না দুটো উদারহরণ দিচ্ছি। এক. গভীর সমুদ্রে পথ হারিয়ে ফেলা নাবিককে অনেক সময় ডলফিনরা পথ দেখায়। কোনও কোনও ডলফিন স্থলভূমি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসে নাবিকদেরকে। অথচ মানুষরা বাগে পেলে নির্মমভাবে হত্যা করে ডলফিনদের। এই বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বেশ

কয়েকবার বেশ কয়েকটি ডলফিন ধরা পড়েছে। প্রত্যেকটি ডলফিনকে হত্যা করেছে মানুষ। কোনও কোনও পথহারা ডলফিন ভুল করে ঢুকে গেছে নদীতে, জেলেদের জালে ধরা পড়েছে। জেলেরা যে তাকে দয়া করে ছেড়ে দেবে গভীর জলে তা নয়, নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

দুই. পৃথিবীর বিশাল সমুদ্র থেকে দ্রুত বিলুপ্ত হচ্ছে তিমি। নীল তিমি তো আজকাল আর দেখাই যায় না। তিমি অত্যন্ত মূল্যবান প্রাণী। অর্থের লোভে নির্বিচারে তিমি হত্যা করছে একশ্রেণীর মানুষ। কেন? তিমিরা তো মানুষের কোনও ক্ষতি করেনি!

তারপর একটু থেমে নীল ডলফিন লিখল, মানুষ বড় অর্থের কাঙাল, লোভী। সমুদ্রতলার পৃথিবীতে কাঙালপনা নেই, লোভ নেই। এজন্য আমি কখনও মানুষ হতে চাই না, আমার ডলফিন জীবন আমার খুব পছন্দের। তবে গান গাওয়ার জন্য আজ একবার কেবল তিমি হতে চেয়েছিলাম। মনের ভেতর ওই যে আরেকজনের কথা শুনেছি সেই আনন্দে।

রবিনের ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে, তোমার মনের ভেতর অন্য আরেকজন কথা বলে কী করে? সে কে? আর একটি নীল ডলফিন না অন্য কেউ?

কিন্তু রবিন তা জিজ্ঞেস করল না। জিজ্ঞেস করল অন্যকথা। মানুষকে পরাধীন জীব বলেছ ঠিক আছে কিন্তু বোকা বললে কেন? মানুষের চে' চালাক জীব আর কিছু আছে পৃথিবীতে?

মানুষ যতটা চালাক ততটাই বোকা। মানুষ তার চারপাশে অনেক রহস্যই বুঝতে পারে না।

যেমন?

যেমন গাছের রহস্য। গাছ হচ্ছে মানুষের সবচে' কাছের প্রাণী। কিন্তু গাছের রহস্য মানুষ বোঝে না। কোনও কোনও গাছ কথা বলে, হাসে, কাঁদে, দুঃখ পায়, আনন্দ করে, এমনকি চলাফেরা করে, মানুষ তা বোঝে না।

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠল রবিন। ভূতগাছটির কথা মনে পড়ল তার। উচ্ছল গলায় রবিন বলল, আমি গাছের রহস্য বুঝি।

গাছ যে কথা বলে আমি শুনেছি। গাছ যে চলাফেরা করে, হাসে, নদীতে নেমে গোসল করে আমি দেখেছি।

গাছের রহস্য বুঝেছ বলেই তুমি এ যাত্রা বেঁচে গেলে।

কী করে?

পরে বলছি। তার আগে তোমার একটা ভুলের কথা বলি।

আমি আবার কী ভুল করলাম?

করেছ।

কখন?

তোমাদের পৃথিবীর হিসেবে আজ সকালে, সী বিচে আসার আগে।

কী ভুল বল তো?

বাংলো থেকে বেরুবার আগে ভূতগাছের দিকে তাকিয়েছিলে তুমি নিজের একখানা ডাল মানুষের হাতের মতো নাড়িয়ে ভূতগাছ তোমাকে সী বিচে যেতে মানা করেছিল। তুমি তার মানা শোননি। শুনলে সমুদ্রে তলিয়ে যেতে না তুমি। ভূতগাছ কিন্তু জানত সী বিচে এলে বিপদে পড়বে তুমি। সমুদ্রে ডুবে যাবে। এজন্য অমন করে মানা করেছিল।

ভূতগাছের মানা আমি খানিকটা বুঝেছি, খানিকটা বুঝিনি। কিন্তু সে তো কথা বলতে পারে, মুখে বলল না কেন?

সে আরেক রহস্য। আমি জানি কিন্তু তোমাকে বলব না। ভূতগাছের কাছ থেকেই জেনে নিও।

রবিন বেশ চিন্তিত হলো।

নীল ডলফিন লিখল, প্রশ্ন কর। প্রশ্ন না করলে অনেক রহস্যেরই কিনারা পাবে না তুমি। আমিও বলতে ভুলে যাব।

রবিন বলল, তাহলে প্রথম থেকেই শুরু করি।

কর।

সমুদ্রতীর হাঁটু অবধি জলের তলায় ওরকম বিশাল থাবায় কে আমার পা চেপে ধরেছিল?

কেউ না।

মানে?

সত্যি কেউ তোমার পা চেপে ধরেনি।

কিন্তু আমি যে স্পষ্ট টের পেলাম, বিশাল উঁচু হয়ে একটা ঢেউ এলো, সেই ঢেউয়ের ভেতর থেকে কে যেন আমার দুপা চেপে ধরল। টেনে নিয়ে গেল গভীর সমুদ্রে।

আসলে কেউ তোমার পা চেপে ধরেনি। বিশাল উঁচু ঢেউয়ের ধাক্কা তুমি সামলাতে পারনি। টালমাটাল হয়ে পড়ে গেছ জলে। তারপর একবার ভেসে উঠেছ, হাবুডুবু খেয়েছ ঠিক তখন আর একটা ঢেউ এসে তোমাকে আরও খানিক দূর টেনে নিয়েছে। বিশাল থাবার ব্যাপারটি তোমার মনের ভুল। জলের টানকেই অমন মনে হয়েছে তোমার। তবে সমুদ্রতলায় কোথাও কোথাও থাকে চোরাস্রোত। হাবুডুবু খেতে খেতে অমন একটি চোরাস্রোতে পড়ে গিয়েছিলে তুমি। চোরাস্রোতে তোমাকে এই এতদূর টেনে এনেছে।

ডুবে যেতে আমি যে অতগুলো নোনাপানি খেলাম, পানি খেয়ে পেট যে আমার ফুলে ঢোল হয়ে গেল সেই পানি গেল কোথায়? আমি তো এখন একদম স্বাভাবিক মানুষ। এ কী করে হলো?

আমি তোমার পেট থেকে নোনা জল বের করে দিয়েছি।

কী করে?

তোমার পেটে চাপ দিয়েছি, নাক মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে গেছে। জলে ডোবা মানুষের পেট থেকে মানুষ যেভাবে পানি বের করে আমার পদ্ধতিটাও প্রায় ওরকম।

আমি তখন কী করছিলাম?

সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। এই যে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি এটা আমার বাড়ি। তুমি যেখানে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলে ওটি একটি অতিকায় শৈবাল, আমার বিছানা। আমি ঘুমোচ্ছিলাম হঠাৎ মনের ভেতর থেকে শুনি কে যেন বলছে, নীল ডলফিন রবিনকে বাঁচাও। রবিন বড় ভাল ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছি আমি। আর কী আশ্চর্য কাণ্ড দেখি ঠিক ঠিক তুমি আমার বাড়ির পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছ। তোমাকে আমি ধরে নিয়ে এলাম। তারপর নিজের বিছানায় শুইয়ে পেট থেকে পানি বের করলাম। তুমি কিছুই টের পেলে না।

টের কিন্তু পেয়েছি।

কী রকম?

ঘুমের ভেতর আমার মনে হলো মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে কে যেন আমার ঘুম ভাঙাচ্ছে।

সে তো আমি। পেট থেকে পানি বের করবার পর আমি তোমার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করেছি।

কিন্তু চোখ খুলে আমি যে দেখলাম তুমি ওদিক থেকে আসছ।

আঙুল তুলে দিকটা দেখাল রবিন।

নীল ডলফিন লিখল, ওদিকে আমার ভাবনাঘর। মনের ভেতর বসে কে আমার সঙ্গে কথা বলছে ভাববার জন্য ওই ঘরে গেছি, সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতর থেকে শুনি নীল ডলফিন রবিনের ঘুম ভেঙেছে। আমি চিন্তিত ভঙ্গিতে ছুটে এসেছি। আসলেই মনের ভেতর বসে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে কি না প্রথম দুবার ব্যাপারটা বিশ্বাসই হয়নি। তৃতীয়বার বিশ্বাস হলো। কারণ তখন তোমার মামাদের নাম, মা এবং নানার নাম, নানা তোমার ছোটমামাকে মাঝে মাঝে আদর করে কী বলে ডাকতেন এসব আমার মনের ভেতর বসে বলে যাচ্ছিল একজন। শুনে বিশ্বাস হলো আমার। আনন্দ হলো। সেই আনন্দে ডিগবাজি খেলাম। কী মজার কাণ্ড বল! আমার মনের ভেতর বসে অচেনা একজন কথা বলছে। যা বলছে তাই ফলে যাচ্ছে। ভাবা যায়! এই আনন্দে আমি একেবারে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম।

রবিন একটু নড়েচড়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, কিন্তু ভূতগাছের কথা তুমি জানলে কী করে?

ডলফিনের মুখে বেশ একটা চিন্তার ছায়া পড়ল। মানুষের মতো ভুরু কোঁচকাল সে। চোখ ছোট করল। তারপর লিখল, কেমন করে জেনেছি তা তো জানি না।

সঙ্গে সঙ্গে খুব কাছ থেকে পরিষ্কার উচ্চারণে কে যেন বলল, আমি জানি।

রবিন এবং ডলফিন একসঙ্গে চমকাল। কে কথা বলল?

তারপর আশ্চর্য একটা কাণ্ড হলো। বিছানার মতো বিশাল শৈবালটি দেখা গেল অক্টোপাসের মতো মৃদু মোলায়েম ভঙ্গিতে তার পাতা দোলাচ্ছে। খানিক আগে পরিষ্কার ভাষায় কথা বলেছে কে যেন। সেই শব্দে নীল ডলফিন এবং রবিন দুজনেই খুব অবাক হয়েছে, এখন শৈবালটির কাণ্ড দেখে সেই অবাক হওয়া বাড়ল তাদের। রবিন কিছু একটা বলতে যাবে তার আগেই নীল ডলফিন লিখল, বড্ড অদ্ভুত ব্যাপার তো। শৈবালটিকে আমি কখনও নড়তে চড়তে দেখিনি। আজ হঠাৎ করে এমন করতে শুরু করল কেন সে?

রবিন কথা বলবার আগেই পরিষ্কার বাংলা ভাষায় কে যেন বলল, এই মাত্র ঘুম ভেঙেছে আমার।

সঙ্গে সঙ্গে রবিন বলল, তুমি কে?

তোমাদের ভাষায় আমারও নাম হওয়া উচিত ভূতগাছ।

তাই নাকি! কিন্তু এখানে তো কোনও গাছ নেই। একটি শৈবাল আছে।

আমিই সে। সমুদ্রতলায় আছি বলে শৈবাল হয়ে আছি।

এসব তুমি কী বলছ?

এতক্ষণেও বুঝতে পারনি? মানুষ হয়েও তুমি বেশ বোকা।

রবিন একটু লজ্জা পেল। একবার নীল ডলফিনের দিকে তাকাল সে। তারপর বলল, তুমি যে বললে তুমি ঘুমিয়ে ছিলে, এখুনি তোমার ঘুম ভাঙল আর নীল ডলফিন বলছে সে কখনও তোমার পাতা নড়তে দেখেনি এই জন্য আমি বিভ্রান্ত হয়ে প্রশ্নটা করলাম। বুঝতে পারছিলাম না কথা আসলে তুমিই বলছ কি না।

আমি বুঝেছি। কিন্তু নীল ডলফিন আমাকে কী করে নড়তে চড়তে দেখবে, সে তো খুব বেশিদিন হয়নি আমার এখানে আছে।

তার মানে অনেকদিন ধরে ঘুমোচ্ছ তুমি?

হ্যাঁ তোমাদের পৃথিবীর হিসেবে একশো বছর। আমি একশো বছর ঘুমোই একশো বছর জেগে থাকি। খানিক আগে একশো বছরের একটি ঘুম পূর্ণ হলো আমার। এখন থেকে একশো বছর জেগে থাকব।

ভারি মজা তো!

হ্যাঁ বেশ মজা। এখন এক সমুদ্র থেকে আরেক সমুদ্রে ছুটে যাব আমি। ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াব।

তারপর বিছানার মতো মেলে রাখা পাতাটি গুটিয়ে ফেলল শৈবালটি। গুটিয়ে ছাতার মতো একটা আকৃতি ধরল এবং দুতিন কদম এগিয়ে এলো। এই দেখে নীল ডলফিন হঠাৎ করে এমন আতঙ্কিত হলো, মুহূর্তকাল কী ভাবল সে তারপর তীরের মতো ছুট লাগাল। চোখের পলকে কোথায় উধাও হয়ে গেল সে।

শৈবাল বলল, আর কোনওদিন নীল ডলফিনের সঙ্গে আমার দেখা হবে না।

রবিন বলল, কেন?

সে খুব ভয় পেয়েছে। সমুদ্রতলার জীবদের ভূতের ভয় আছে।

কিন্তু তুমি তো তাকে ভয় দেখাওনি।

ভয় না দেখালেও কোনও কোনও জীব ভয় পায়।

আমি তো পাচ্ছি না।

তোমার না পাওয়ার কারণ আছে।

কী কারণ?

আমার আগেও তুমি একটি ভূতগাছ দেখেছ। সে তোমার সঙ্গে কথা বলেছে, তাকে তুমি চলাফেরা করতে দেখেছ। তাছাড়া সমুদ্রতলায় তুমি এখন আছ সম্পূর্ণ অন্যরকম এক অবস্থায়। পৃথিবীর মানুষদের মতে এই অবস্থাটির নাম না জীবিত না মৃত। এই অবস্থায় মানুষের কোনও ভয় থাকে না।

কিন্তু ওরকম অবস্থা হলে আমি নীল ডলফিনের সঙ্গে নিজেকে নিয়ে অত কথা বললাম কী করে! তোমার সঙ্গেই বা বলছি কী করে?

আমাদের কাছে তুমি সম্পূর্ণ জীবিত।

তারপরই রবিনের মনে হলো নীল ডলফিন উধাও হয়ে গেছে কিন্তু তার কাছে অনেক কিছু জানার ছিল রবিনের।

শৈবালটি বলল, নীল ডলফিনের কাছে যা জানতে চাওয়ার ছিল সেগুলো তুমি আমার কাছ থেকে জানতে পার।

রবিন আবার অবাক হলো। তুমি কি মনের কথা শুনতে পাও?

পাই।

তাহলে তো জানোই আমি নীল ডলফিনের কাছে কী জানতে চাইতাম।

কী কী নয় শুধু, একটি জিনিস তোমার জানার বাকি ছিল। তা হলো সমুদ্রতলার পৃথিবীতে তুমি কতদিন ধরে আছ।

হ্যাঁ তাই।

আমি বলে দিচ্ছি। সোয়া দুমাস ধরে এখানে আছ তুমি। তোমাদের পৃথিবীর হিসেবে সোয়া দুমিনিট। তুমি যখন ফিরে যাবে তখন পৌনে তিন মিনিট হবে। সমুদ্রতলার পৃথিবীতে পৌনে তিন মাস।

তার মানে আরও পনেরো দিন কিংবা আধা মিনিট তোমার সঙ্গে আছি আমি?

হ্যাঁ।

তারপর?

তারপর টেকনাফের সী বিচে ফিরে যাবে।

কীভাবে?

আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।

তাহলে এক্ষুনি দাও, দেরি করছ কেন?

দেরি করছি নিজের জন্য। আমার সম্পর্কে তুমি এখনও কিছু জানোনি। অনেক কিছু জানার আছে তোমার।

বল।

আমি কেন নিজেকে ভূতগাছ বললাম জানো?

না।

তোমাদের বাংলোর ভূতগাছটির সঙ্গে আমার স্বভাব চরিত্রের খুব মিল। সে ডাঙায় বসে আমার সঙ্গে কথা বলে সমুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে আমি তা শুনতে পাই। এই রকম তিনটি গাছ আছে পৃথিবীতে। সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যক্রমে তিনটি গাছই আছে বাংলাদেশে এবং পঁচিশ তিরিশ মাইল দূরত্বের মধ্যে।

কোথায় কোথায় বল তো।

দুটো তো তুমি দেখলেই। একটি টেকনাফে আর একটি এই যে আমি। আর একটি আছে সেন্টমার্টিন দ্বীপে। সেই গাছটির সঙ্গেও তোমার দেখা হবে।

তাই নাকি। কী করে?

তুমি সেন্টমার্টিনে যাবে।

কার সঙ্গে?

সাইফুদ্দিন তোমাকে নিয়ে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে নীল ডলফিনের মুখে শোনা রবিনের মামাদের নাম, নানা এবং মায়ের নামের কথা মনে পড়ল রবিনের। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করতে যাবে সে, শৈবাল বলল, নীল ডলফিনকে আমিই ওসব জানিয়েছি। আমি ওর মনের ভেতর ঢুকে গিয়েছিলাম।

তুমি নাকি ঘুমিয়ে ছিলে! তাহলে আবার মনের ভেতর ঢুকলে কী করে?

ঘুমিয়ে ছিলাম বলেই ঢুকতে পেরেছি। জেগে থাকলে পারতাম না।

মানে?

যে একশো বছর ঘুমোই আমি সেই একশো বছর চলাফেরা করতে পারি না। নিজ মুখে কথা বলতে পারি না। কথা তখন বলতে হয় অন্যের মনের ভেতর ঢুকে। অন্যের মাধ্যমে। আসলে আমার কথাগুলো নীল ডলফিনের মুখ থেকে তুমি শুনেছ।

তারপর আরও দুতিন কদম হাঁটল শৈবালটি, বলল, তুমি সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের বাংলোর ভূতগাছ আমাকে বলল, রবিন ডুবে

যাচ্ছে তাকে তুমি বাঁচাও। রবিন বড় ভাল ছেলে। আমার পাতার ওপর শুয়ে নীল ডলফিন তখন ঘুমোচ্ছে। আমি তার মনের ভেতর ঢুকে গেলাম।

সে তোমাকে বাঁচাল। এখানে নিয়ে এলো।

রবিন বলল, এবার তোমার কথা বল। আমার মামাদের নাম, নানা এবং মায়ের নাম তুমি জানলে কী করে?

আমাকে বাংলোর গাছটি জানিয়েছে।

হঠাৎ ওসব জানাতে গেল কেন?

তা তো জানি না, ফিরে যাওয়ার পর তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো।

তুমি বললে পৃথিবীর মানুষের মতে আমি এখন অচেতন অবস্থায় আছি, না জীবিত না মৃত। ফিরে যাওয়ার পর তো তোমার কিংবা নীল ডলফিনের কথা, সমুদ্রতলার এত যে ব্যাপার কোনওটাই তাহলে আমার মনে থাকবার কথা নয়।

হ্যাঁ তা ঠিক।

তার মানে তোমাদের কথা আমি তাহলে কাউকে বলতে পারব না।

সব বলতে পারবে না। কোনও কোনওটা পারবে।

যেমন?

সময় নেই এখন। অত ফিরিস্তি দেয়া যাবে না। শুধু দুটো তোমাকে বলে দিচ্ছি। এক. গভীর সমুদ্রে তিমিরা যে দল বেঁধে গান গায়, মানুষ যে তা রেকর্ড করেছে এ বিষয়টা তোমার মনে থাকবে। এ বিষয়ে তুমি তোমার ছোটমামাকে জিজ্ঞেস করবে। দুই. তোমার নানা যে তোমার ছোটমামাকে ছেলেবেলায় আদর করে মাউরা বলে ডাকতেন এটাও তোমার মনে থাকবে। এবার চল।

কোথায়?

তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

কেমন করে?

সে তুমি বুঝতে পারবে না। এখুনি ফিরিয়ে না দিয়ে এলে সমস্যা হয়ে যাবে। সেন্টমার্টিন দ্বীপে তুমি কখনও যেতে পারবে না।

কেন?

ফিরে যাওয়ার পর তুমি তা বুঝতে পারবে।

তারপরই নিজের আকৃতিটা বিছানার মতো করে ফেলল শৈবাল। বলল, রবিন, তুমি আমার পাতার ওপর শুয়ে পড়।

লাফ দিয়ে বিছানায় ওঠার মতো করে শৈবালটির পাতার ওপর উঠল রবিন। শুয়ে পড়ল।

শৈবাল বলল, এবার তুমি চোখ বোজ।

রবিন আলতো করে চোখ বুজল। সঙ্গে সঙ্গে রবিনের মনে হলো হাওয়ার বেগে ওপরের দিকে কেউ তাকে ছুড়ে দিচ্ছে।

তারপর রবিনের আর কিছু মনে নেই।

ছোটমামার চিৎকারে সমুদ্রতীরের সব জেলে ছুটে এসেছে। নিজেদের মাছ ধরা জাল টানতে ভুলে গেছে তারা। এ ওর দিকে তাকাতাকি করছে, দিশেহারা হয়ে কথা বলছে। ফলে ছোটমামার পাশে বেশ একটা ভিড়, কোলাহল। কিন্তু ছোটমামা কোনওদিকে তাকাচ্ছেন না, সমানে চিৎকার করছেন, রবিন ডুবে গেছে, রবিন ডুবে গেছে।

এইমাত্র দুজন মানুষকে সমুদ্রতীরে আসতে দেখেছে জেলেরা, আয়েশি ভঙ্গিতে সমুদ্রতীরে হেঁটে বেড়াতে দেখেছে। এর মধ্যেই একজন ডুবে যায় কী করে! আর এখানটায় তো জলও তেমন গভীর নয়। অনেকখানি হেঁটে গেলেও বুক অব্দি হবে না। এত কম জলে মানুষ ডোবে কী করে! একেবারেই শিশু হলে না হয় কথা ছিল, কিন্তু রবিন নামের ছেলেটি তো অত ছোট নয়। বেশ বড়। তাহলে?

জেলেদের কারও মাথায় কিছু ঢুকছিল না। তবু জলের তলা থেকে রবিনকে খুঁজে বের করার চিন্তা ভাবনা করল তারা। বয়স্ক একজন জেলে ছোটমামাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলল, সাহেব ও সাহেব, একটু শান্ত হোন, একটু শান্ত হোন আপনি। আমরা দেখছি কী করা যায়। কেমন করে আপনার ছেলেকে উদ্ধার করা যায়।

এ অবস্থায়ও বেশ রাগি চোখে জেলেটির দিকে তাকালেন ছোটমামা। খুঁকুড়ে গলায় বললেন, তুমি তো মহা বেকুব লোক হে। নাম কী তোমার? কাউকে বোকা ভাবলে কিংবা কারও ওপর হঠাৎ করে রেগে গেলে প্রথমেই ছোটমামা তার নাম জিজ্ঞেস করেন। এখনও তাই করেছেন। তবে তার কথায় যাকে নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছে সেই জেলেটি তো বটেই ছোটমামার

চারপাশে ভিড় করা সব জেলেই সাংঘাতিক অবাক হয়েছে। যার সঙ্গের ছেলেটি সমুদ্রে ডুবে গেছে সে কেমন করে এই অবস্থায় অচেনা একজন মানুষের নাম জিজ্ঞেস করে!

থতমত খেয়ে বয়স্ক জেলেটি তার নাম বলল। জ্বি আমার নাম সাহেব, হেকমত, হেকমত আলী।

সঙ্গে সঙ্গে ছোটমামা বললেন, কী করো তুমি?

মাছ ধরি।

কী মাছ?

সমুদ্রের মাছ। রূপচাঁদা, লইট্টা। আরও অনেক রকম মাছ। নাম জানি না। আমাদের জালে ধরা পড়ে এমন সব মাছের নাম আমরা জানি না। সমুদ্রের সব মাছের নাম কেউ জানে না।

ছোটমামার রাগ এবার আর একটু বাড়ল। প্রায় মুখ ভেঙচে তিনি বললেন, নাহ কেউ জানে না। তুমি জান না সে কথা বল। তোমার জানবার কথাও নয়। দেখলেই বোঝা যায় তুমি একটা বেকুব। অনেক কিছুই জানো না। কে ছেলে কে ভাগ্নে দেখে বোঝা যায় না? রবিন আমার ছেলে নয়, ভাগ্নে।

আরেকজন জেলে ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল, কিন্তু সে ডুবল কী করে? আপনি সঙ্গে আছেন এই অবস্থায় অতটুকু একটা ছেলে পানিতে ডুবে যায় কী করে! আপনি দেখলেন না? আপনি তাকে ধরতে পারলেন না?

হেকমত নামের জেলেটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে রবিনের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলেন ছোটমামা। রেগে গিয়েছিলেন তো এজন্য এমন হয়েছে। এখন অন্য জেলেটির কথায় মনে পড়ল। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার দিশেহারা হয়ে গেলেন। আবার চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলেন। তাই তো, রবিন ডুবে গেছে। হায় হায় কী হবে এখন। বাংলোয় ফিরে গিয়ে রবিনের মা বাবাকে আমি কী জবাব দেব! হায় হায় একি সর্বনাশ হলো! তারচে' আমিও বরং জলে ডুবে যাই তাহলে আর কাউকে কোনও জবাবদিহি করতে হবে না।

ছোটমামা প্রায় লাফিয়ে পড়তে গেলেন সমুদ্রে।

হকমত জেলে তার একটি হাত চেপে ধরল। না না এমন করবেন না সাহেব, এমন করবেন না। এই অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। আপনার পাশ থেকে এই সামান্য জলে ছেলেটি ডুবে গেল কী করে? আপনি তাকে ধরতে পারলেন না?

ছোটমামা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, কী করে ধরব! আমি তো সাঁতার জানি না।

এই বয়সী একটি লোক সাঁতার জানে না শুনে জেলেরা কেউ কেউ মুখ টিপে হাসতে লাগল। একজন রসিক ধরনের জেলে তার নামও রসিক, রসিকলাল বলল, তাহলে তো আপনার ষোল আনাই মিছে সাহেব।

এই অবস্থায় আবারও বেশ অবাক হলেন ছোটমামা। চোখ সরু করে রসিকলালের দিকে তাকালেন। তুমি তো বেশ সমঝদার লোক হে! সেই মাঝি আর বাবু মশায়ের কবিতাটি পড়েছ না? ভাল, ভাল। জেলেদেরও পড়াশুনো করা উচিত।

হেকমত বলল, ও রসিক গল্প করলে হবে নাকি! ছেলেটিকে উদ্ধার করবি না? যা সবাই মিলে ঘেরজাল নিয়ে আয়। এদিকটায় জাল ফেল। ছেলেটিকে যদি পাওয়া যায় তাহলে তাকে বাঁচানও যাবে। যা তাড়াতাড়ি কর।

ছোটমামার আবার মনে পড়ল রবিন নেই। রবিন সমুদ্রে ডুবে গেছে। এবার ছোটমামার বুকের ভেতর উথলে উঠল সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো গভীর কান্না। রবিন, রবিনরে, তুই কেমন করে ডুবে গেলিরে। বলে হাউমাউ করে মাত্র একখানা কান্না কাঁদতে শুরু করবেন তিনি দেখা গেল বুক সমান জলের তলা থেকে ডুব দিয়ে ওঠার মতো করে সমুদ্রতীরের কাছাকাছি একটি জায়গায় উঠে দাঁড়িয়েছে রবিন। মুখটা হাসি হাসি। যেন গভীর আনন্দে সমুদ্রে নেমে হাবুডুবু খেয়ে গোসল করেছে সে। এইমাত্র একটি ডুব দিয়ে উঠল। এখন জল ভেঙে আস্তে ধীরে হেঁটে তীরের দিকে আসছে। রবিনের দিকে তাকিয়ে চোখে পটপট করে কয়েকটি পলক পড়ল ছোটমামার। দৃশ্যটি যেন তাঁর বিশ্বেস হচ্ছে না। এত অবাক জীবনে কখনও তিনি হননি।

রবিনকে দেখে ছোটমামার চারপাশে ভিড় করা জেলেরা তখন আনন্দে কোলাহল শুরু করেছে। আরে! ওই তো ছেলেটি! সে তো ডোবেনি!

রবিনকে দেখতে দেখতে চিন্তিত গলায় হেকমত বলল, এতক্ষণ ছেলেটিকে আমরা কেউ দেখলাম না যে! কোথায় ছিল সে?

রসিক বলল, কোথায় আবার, পানিতে।

পানিতে কি লুকিয়ে থাকা যায়?

যাবে না কেন? ডুব দেয়া মনেই তো লুকানো।

এতটুকু একটা ছেলে ডুব দিয়ে কতক্ষণ থাকতে পারে?

রসিক নির্বিকার গলায় বলল, কে জানে।

আমার কিন্তু অন্যরকম একটা সন্দেহ হচ্ছে।

কী সন্দেহ?

সমুদ্রের এই দিকটা কিন্তু ভাল না।

কেন কী হয়েছে এই দিকে?

এই দিকে কখনও কোনও জেলেকে জাল ফেলতে দেখেছিস?

রসিক চিন্তিত গলায় বলল, না দেখিনি তো!

কেন দেখিসনি জানিস?

না।

তোদের বয়স কম সমুদ্রের কিছুই তোরা জানিস না।

না বললে জানব কী করে? বল শুনে রাখি।

হেকমত বলল, একটু পর বলছি দাঁড়া। দেখি ছেলেটি কী বলে। রবিন তখন তীরে চলে এসেছে। ভেজা জামাকাপড় তার সমুদ্রের হাওয়ায় সপসপ করছে। মাথার চুল লেপটা লেপটি করে আছে মাথায়। তবে চোখে মুখে ভারি একটা আমুদে ভাব। প্রথমে ছোটমামার দিকে তাকাল সে। তারপর তাকাল জেলেদের দিকে। হাসিমুখে বলল, এখানে এত ভিড় হয়েছে কেন?

রবিনকে জলে ভেসে উঠতে দেখে আসলে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ছোটমামা। রবিনের কথায় রুদ্ধ বাক খুলে গেল তাঁর। গভীর আবেগে পাগলের মতো করে রবিনকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। কান্না হাসির মিশেল

দেয়া অদ্ভুত স্বরে বললেন, তুই কেমন করে ডুবে গেলি? কেমন করে বেঁচে এলি রবিনহুড?

রবিন নির্বিকার গলায় বলল, ডুবে যাওয়ার পর নীল ডলফিন আমাকে তার বাড়ি নিয়ে যায়। সেই বাড়িতে আমাদের বাংলোর ভূতগাছের মতো একটি শৈবাল আছে, আমি তার পাতার ওপর শুয়েছি সে আমাকে ওপরের দিকে ছুড়ে মারল, আমি তারপর দেখি বুক সমান জলে দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা দাঁড়িয়ে আছ তীরে, এই তো। তারপর এখন উঠে এলাম।

রবিনের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন ছোটমামা। আমার সঙ্গে দুষ্টুমি, না? দুতিন মিনিট ডুব দিয়ে থেকে এখন গল্প বানাচ্ছ! ইস যা ভয়টা আমাকে তুই পাইয়ে দিয়েছিস! এমন দুষ্টুমি আমার সঙ্গে আর কোনওদিন করবি না।

রবিন কথা বলবার আগেই ভিড় করা জেলেরা হো হো করে হাসতে লাগল।

রসিকলাল বলল, বাহ বাবা বাবা বা, এত ছোট ভাগ্নে এতবড় মামাকে এতবড় নাজেহাল করল! এ তো দেখি সিনেমা। চল যে যার কাজে চল ভাই।

অন্যান্য জেলেদের সঙ্গে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে রসিকলাল, হেকমত আস্তে করে তার হাত ধরল। তুই যাসনে রসিক। তুই দাঁড়া।

রসিকলাল খুবই অবাক হলো। কেন?

কথা আছে।

তারপর হাত ইশারায় অন্যান্য জেলেদের চলে যেতে বলল হেকমত। তোমরা যাও আমরা আসছি।

জেলেরা চলে গেল। তারপর একবার রবিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রসিকলালের কানে কানে হেকমত বলল, ছেলেটি কিন্তু সত্য কথা বলছে।

রসিকলাল একেবারে আঁতকে উঠল। কী?

হ্যাঁ সে যা বলছে একটিও মিথ্যে নয়। আমি জানি।

তুমি জান কী করে?

দাঁড়া, বলছি।

ঠিক তখুনি হেকমত এবং রসিকলালের দিকে তাকাল রবিন। বহুকালের পরিচিত মানুষের মতো আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল, তোমাদের ব্যাপারটা কী হেকমত, তুমি আর রসিকলাল যে দাঁড়িয়ে রইলে? যাও মাছ ধরতে যাও। রবিনের কথা শুনে হেকমত এবং রসিকলাল আঁতকে উঠল। তাদের নাম রবিন জানল কী করে?

ছোটমামাও কম অবাক হননি। চোখে পটপট করে কয়েকটি পলক ফেললেন তিনি। কী রে রবিনহুড তুই এদেরকে চিনিস নাকি?

রবিন নির্বিকার গলায় বলল, না।

তাহলে নাম বললি কী করে?

রবিন চিন্তিত গলায় বলল, জানি না তো।

সমুদ্রের যে দিকটায় মাছ ধরছিল জেলেরা সেদিক হাঁটতে হাঁটতে হেকমত বলল, ও রসিক বুঝলি কিছু?

রসিকলাল চিন্তিত ভঙ্গিতে হাঁটছিল। হেকমতের কথা শুনে তার মুখের দিকে তাকাল, না। কিছুই বুঝতে পারলাম না।

রবিন আমাদের নাম বলল কী করে?

রবিন কে?

আরে ওই যে ছেলেটি, সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল যে!

হাঁটা থামিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে হেকমতের দিকে তাকিয়ে রইল রসিকলাল।

রসিকলালকে থামতে দেখে হেকমতও থামল। ভুরু কুঁচকে বলল, কী হলো? থামলি কেন?

ছেলেটির নাম যে রবিন তুমি জানলে কী করে?

হেকমত হাসল। এর মধ্যে কোনও রহস্য নেই। ছেলেটির মামার মুখ থেকে শুনলাম। রবিন ডুবে গেছে দেখে সে চিৎকবার করে বলেছিল না, রবিন ডুবে যাচ্ছে, রবিন ডুবে যাচ্ছে। ওই শুনেই তো আমরা ছুটে এলাম।

রসিকলাল নিশ্চিন্ত হয়ে একটা হাঁপ ছাড়ল। তারপর হাঁটতে শুরু করল। তাই তো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কেমন যেন একটা ব্যাপার হয়ে গেল। ছেলেটি সমুদ্রে ডুবে গেল, একা একা আবার উঠেও এলো। উঠে এসে নীল ডলফিন এবং আরও কী কী যেন বলল।

সবচে' আশ্চর্য ঘটনাটাই তো তুই বলছিস না।

পুরোটাই তো আশ্চর্য ঘটনা। কোনটার কথা বলছ?

রবিন যে তোর আর আমার নাম বলে দিল, কী করে বলল?

আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন হয়তো আমাদের নাম সে শুনেছে।

কার কাছে শুনবে? কেউ তো আমাদের নাম বলেনি।

ওই যে তুমি একবার আমাকে বললে, রসিক জাল আন।

রবিন তো তখন জলের তলায়! সেখান থেকে আমার কথা সে শুনবে কী করে? আমি তো তখন তোর পুরো নামও বলিনি। অর্ধেকটা বলেছি। রসিক। রবিন তো পুরোটাই বলল। রসিকলাল। ঠিক আছে, বুঝলাম না হয় আমার মুখ থেকে তোর নামটা সে জেনেছে, আমারটা জানল কী করে?

ছেলেটির মামা তোমার নাম জিজ্ঞেস করল না? ওই থেকে জেনেছে।

তখন তো সে জলের তলায়। তারপরও ব্যাপার আছে, রবিনের মুখে আমাদের নাম শুনে ওর মামা জিজ্ঞেস করল না সে আমাদের চেনে কিনা, নাম জানল কী করে! রবিন তো বলল কী করে জানল তা সে জানে না।

হ্যাঁ, খুবই ভুতুড়ে কাণ্ড দেখছি। ছেলেটাকে বোধহয় ভূতে ধরেছে। ভূতের আছর হয়েছে ওর ওপর।

হেকমত গম্ভীর গলায় বলল, না। এর মধ্যে অন্য ব্যাপার আছে।

রসিকলাল মুখ ঘুরিয়ে হেকমতের দিকে তাকাল। কী ব্যাপার?

তোকে আমি বললাম না রবিন প্রতিটি কথা সত্য বলছে।

হ্যাঁ।

আসলেই সত্য কথা বলেছে সে।

তার মানে সত্যি সত্যি সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল সে, চোরাস্রোতে পড়েছিল, নীল ডলফিনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সব সত্যি?

হ্যাঁ।

তাহলে বেঁচে ফিরে এলো কী করে?

এটাই আশ্চর্য লাগছে। বেঁচে ফিরে আসার কথা না। আমি তোকে বললাম না রবিন যেখানটায় ডুবে গিয়েছিল সমুদ্রের ওই দিকটা ভাল না! কোনও জেলেকে কখনও দেখেছিস ওই দিকটায় জাল ফেলতে! কাউকে কখনও দেখেছিস ওই দিকটায় নেমে গোসল করতে? করে না। আসলেই

ওখানটায় আছে এক চোরাস্রোত। যে কেউ নামলে ডুবে যাবে। তার আর ফেরার উপায় থাকবে না। সমুদ্রের ওই দিকটায় নীল ডলফিন ছাড়া আর কোনও মাছ থাকে না। বিশাল একটা শৈবাল নাকি আছে সমুদ্রের তলায়। নীল ডলফিনটি যেমন ভুতুড়ে শৈবালটিও তেমনি ভুতুড়ে। ডুবে যাওয়া মানুষ নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে।

তুমি এসব জানলে কী করে?

আমার দাদার মুখে শুনেছি। সমুদ্রের অনেক রহস্যের কথা জানতেন আমার দাদা।

তোমার দাদা জেনেছিলেন কার কাছে?

তার দাদার কাছে।

রসিকলাল হেসে বলল, সেই লোক নিশ্চয় জেনেছিল তার দাদার কাছে। ভুতুড়ে গল্পকথা এভাবেই চলে আসে হাজার বছর ধরে। এসব আমি বিশ্বাস করি না।

হেকমত বিরক্ত হয়ে বলল, চোখের সামনে এমন একখানা ঘটনা দেখলি, নিজের কানে শুনলি জীবনেও তোর নাম শোনেনি এমন একজন বলছে তোর নাম! তারপরও বিশ্বাস করবি না?

না করব না।

কেন?

এইসব রহস্য নিয়ে মাথা ঘামালে বেঁচে থাকতে খুব ঝামেলা হয়ে যাবে। সমুদ্র জিনিসটা এত বড়, এত বিশাল, এর তো অনেক রহস্য থাকবেই! এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। চল মাছ ধরতে যাই।

হেকমত আর কোনও কথা বলল না।

রিকশার হুড তুলে সিটের ওপর ট্যাংরা মাছের মতো বাঁকা হয়ে ঘুমোচ্ছে রিকশাঅলা। ছোটমামার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সেই রিকশাটির সামনে এসে দাঁড়াল রবিন। গম্ভীর গলায় ডাকল, আজিজুল, এই আজিজুল ওঠ।

সঙ্গে সঙ্গে ধড়ফড় করে উঠল রিকশাঅলা। কে ডাকল? কে আমার নাম ধরে ডাকল?

রবিন নির্বিকার গলায় বলল, আমি ডেকেছি।

আপনি আমার নাম জানেন সাহেব?

জানি।

কখন জানলেন? কীভাবে জানলেন?

তা তো জানি না।

রিকশাঅলা খুবই অবাক হলো। রিকশায় ওঠার সময় আমার নাম তো আপনারা কেউ জিজ্ঞেস করেননি? আমিও বলিনি! তাহলে?

ছোটমামা বললেন, তোমার নাম আজিজুল?

জ্বি সাহেব।

রবিন আন্দাজেই তোমার নামটা বলেছে। মুখে আজিজুল নামটা এসেছে আর বলে ফেলেছে। আন্দাজে ঢিল ঠিক জায়গায় লেগে গেছে আর কী! ওই যে কথায় আছে না, ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে। ও কিছু না। চল।

ছোটমামার সঙ্গে রিকশায় উঠে বসল রবিন। সমুদ্রের হাওয়ায় দ্রুত শুকিয়ে আসছে তার জামাকাপড়। তবে জামাকাপড়ের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই তার। কী রকম চিন্তিত হয়ে আছে সে। কী যেন ভাবছে।

ছোটমামা ওসব খেয়াল করলেন না। উচ্ছল গলায় বললেন, ভারি মজা হলো রে আজ রবিনহুড, তুই সমুদ্রে নেমে গোসল করার জন্য ডুব দিলি

আমি ভাবলাম ডুবে গেছিস। চিৎকার চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করে ফেললাম। বেশ লম্বা একখানা ডুব দিয়ে উঠে তুইও দিলি তাক লাগিয়ে। সবচাইতে তাক লাগিয়েছিস নীল ডলফিনের গল্প বলে।

রবিন ছোটমামার দিকে মুখ ফেরাল। গল্প না ওটা সত্য।

ছোটমামা হাসলেন। আমার সঙ্গে চালাকি হচ্ছে।

না হচ্ছে না।

তবে তোর একটা ব্যাপার আমি খুব এপ্রিশিয়েট করছি। আন্দাজে জেলে দুটোর নাম বললি তুই, লেগে গেল। রিকশাঅলার নাম বললি, লেগে গেল। এটা দারুণ দেখিয়েছিস। আন্দাজে বলা তিনটি নাম ঠিক ঠিক লেগে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয় রে। এটা এপ্রিশিয়েট না করে পারা যায় না।

রবিন গম্ভীর গলায় বলল, আন্দাজে বলিনি। জেনে বলেছি।

কোথায় জানলি? কেমন করে জানলি?

তা জানি না।

আবার চালাকি!

চালাকি নয়, সত্যি। তুমি চাইলে তা প্রমাণ করতে পারি।

কীভাবে?

ধরো তোমার ছেলেবেলার কোনও একটি কথা, যা তুমি ছাড়া এখন আর কারও মনে নেই, তোমার অন্যান্য ভাইবোনরাও জানে কিন্তু মনে নেই কারও এমন একটি কথা এই মুহূর্তে বলে দিতে পারি আমি।

ছোটমামা অতি উৎসাহী গলায় বললেন, বল তো দেখি।

সবচে' ভাল হয় তুমি প্রশ্ন করলে।

কী ধরনের প্রশ্ন করব?

যে কোনও ধরনের।

ছোটমামা সামান্যক্ষণ ভেবে বললেন, খুব ছোটবেলায় বাবা আমাকে আদর করে মাঝে মাঝে অদ্ভুত একটা নামে ডাকতেন, বল তো সেই নামটা কী?

রবিন হাসিমুখে ছোটমামার মুখের দিকে তাকাল। বলব?

বল না, দেখি বাহাদুরি।

মাউরা।

ছোটমামার চোখ মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কী বললি? কী বললি তুই?

বললাম, নানা তোমাকে মাউরা বলে ডাকতেন।

বলিস কী?

হ্যাঁ।

কী করে বললি?

ঠিক বলেছি কিনা এটা আগে বল।

ঠিক বলেছিস, একদম ঠিক বলেছিস।

তারপরই হাসলেন ছোটমামা। কী করে বলেছিস আমি জানি।

কী করে বল তো?

নিশ্চয় কোনও একদিন বুবু তোকে বলেছে তুই তা মনে রেখেছিস।

না, মা আমাকে কখনও একথা বলেনি। আমাকে বলেছে নীল ডলফিন।

আবার সেই গল্প!

তারপর একটু থেমে ছোটমামা বললেন, ঠিক আছে, এতই যখন ক্ষমতা অতীত বাদ দিয়ে এখন ভবিষ্যৎ বল তো! বাংলোতে গিয়ে এখন কী দেখব আমরা?

রবিন বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বলল, গিয়ে দেখব চেয়ার নিয়ে বাংলোর সামনের রেলিংয়ে বসে গল্প করছেন মা বাবা। মার পরনে আকাশি রঙের শাড়ি, বাবা পরে আছেন সাদা পাজামা পাঞ্জাবি, বাংলো বরাবর নাফ নদীতে ভাসছে তিনটি জেলে নাও। মা বাবার বেডরুমে টেপরেকর্ডারে বাজছে সাগর সেনের রবীন্দ্রসঙ্গীত।

কোন গানটা বাজতে থাকবে তাও বল।

আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে।

ঠিক আছে, দেখা যাবে।

রিকশা তখন গাছপালার আড়ালে পড়েছে। এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় না। সমুদ্রের শব্দ পাওয়া যায়। এতক্ষণ কী রকম একটা ঘোরের মধ্যে যেন ছিল রবিন। সমুদ্র আড়ালে পড়ে যাওয়ার ফলে, সমুদ্র আর দেখতে পাচ্ছে না বলে হঠাৎ করেই সেই ঘোরটা যেন কেটে গেল তার। ছোটমামার সঙ্গে কী কথা হয়েছে এতক্ষণ, জেলে এবং রিকশাঅলা কার কী নাম নিজ মুখে বলেছে সে সব ভুলে গেল। মন এবং শরীর হালকা হয়ে গেল রবিনের। রবিন একেবারে আগের রবিন হয়ে গেল।

বাংলোতে ঢুকে রবিন বলল, আমি বাথরুমে ঢুকছি মামা। গা কী রকম লবন লবন লাগছে। গোসল করে ফ্রেশ হয়ে আসছি। তুমি রুমে বস।

ছোটমামা মুখের হাসি দুকান অবধি লম্বা করলেন, কেন রুমে বসব কেন?

তাহলে কী করবে?

আপা দুলাভাইকে খুঁজব।

কেন?

তোমার কথাটা প্রমাণ করতে হবে না?

রবিন খুবই অবাক হলো। আমার কোন কথা প্রমাণ করতে হবে?

আবার চালাকি?

রবিন বুঝতে পারল না কী চালাকি করছে সে। ফ্যাল ফ্যাল করে ছোটমামার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কয়েক পলক রবিনকে দেখলেন ছোটমামা। তারপর বললেন, তুই খুবই জিনিয়াস রবিনহুড। বড় হলে কিছু একটা হয়ে যাবি। কী হবি তা কিন্তু আমি বলতে পারি।

বল তো।

অভিনেতা। অভিনয় জিনিসটা খুব ভাল জানিস তুই।

কী করে বুঝলি?

সমুদ্রতীরে তোকে দেখলাম এক রকম, রিকশায় দেখলাম আরেক রকম, এখন বাংলোতে এসে দেখছি আরেক রকম। অভিনেতা ছাড়া এত দ্রুত নিজেকে কেউ বদলাতে পারে না।

ছোটমামার কথা কিছুই বুঝতে পারল না রবিন। কখন নিজের চেহারা এবং আচরণ তিন রকম করেছে সে! সে তো সব সময়ই এক রকম।

কিছু একটা বলতে যাবে রবিন ছোটমামা বললেন, ঠিক আছে তুই গোসল টোসল করে আয় আমার যা দেখার আমি দেখে নেব।

এবারও ছোটমামার কথা বুঝতে পারল না রবিন। তবে সে আর কোনও কথা বলল না, বাথরুমের দিকে চলে গেল। আর ছোটমামা চলে এলেন রেলিংয়ের দিকে। জায়গাটায় এসে হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি। বাংলোর সামনের দিককার রেলিং দেয়া বারান্দায় চেয়ার নিয়ে পাশাপাশি বসে আছেন রবিনের মা বাবা। মায়ের পরনে আকাশি রঙের শাড়ি আর বাবা পরে আছেন সাদা পাজামা পাঞ্জাবি। রবিন যেমন বলেছে হুবহু তেমন।

স্তব্ধ হয়ে রবিনের মা বাবার দিকে তাকিয়ে রইলেন ছোটমামা। তখুনি তাঁর মনে পড়ল রবিন বলেছিল নদীতে বাংলো বরাবর ভাসতে দেখা যাবে তিনটি জেলে নাও।

চঞ্চল চোখে নদীর দিকে তাকালেন ছোটমামা। তাকিয়ে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো তাঁর। আশ্চর্য ব্যাপার ঠিকই তিনটি জেলে নাও ভাসছে বাংলো বরাবর নদীতে।

আর আর যেন কী বলেছিল রবিন! মা বাবার বেডরুমে...!

ছোটমামার ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই রবিনের মা বাবার বেডরুম থেকে ভেসে এলো সাগর সেনের রবীন্দ্রসঙ্গীত।

আজি আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে
আহা আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগলমুরতি।
ফুলগন্ধে আকুল করে বাজে বাঁশরি উদার স্বরে
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে।

এতটা অবাক জীবনেও হননি ছোটমামা। রবিনের মা বাবার অদূরে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

ছোটমামাকে প্রথম দেখলেন রবিনের মা। হাসিমুখে বললেন, কী রে কখন এলি তোরা?

বোনের কথায় পাথর ভাবটা ভেঙে গেল ছোটমামার। সামান্য কেশে বললেন, এই মাত্র।

রবিন কই?

গোসল করতে ঢুকল।

রবিনের বাবা বললেন, সমুদ্রে নেমেছিলি নাকি?

হ্যাঁ।

রবিনের মা বললেন, বলিস কী! রবিন তো সাঁতার জানে না!

সমুদ্রতীরে কী ঘটেছিল সবকথা বোনকে খুলে বলতে শুরু করলেন ছোটমামা। খানিক বলার পর টের পেলেন কথা তিনি ঠিকই বলছেন তবে সে কথা কেউ শুনছে না। কেবল তিনিই শুনছেন। আসলে ছোটমামার কথায় কোনও শব্দ হচ্ছে না।

ছোটমামা একেবারে বেকুব হয়ে গেলেন।

রবিনের মা তাকিয়ে ছিলেন ছোটমামার দিকে। বললেন, কী রে কথা বলছিস না কেন?

এবার কথা বললেন রবিনের বাবা। সাঁতার না জানলেও সমুদ্রে নামা যায়। সমুদ্রের বহুদূর অবধি হেঁটে গেলেও হাঁটুজল থাকে।

ঢেউ এসে যদি ভাসিয়ে নিয়ে যেত!

এত ভয় পেয়ো না। বাচ্চাদেরকে এত আগলে রাখা ভাল না।

তারপর ছোটমামার দিকে তাকালেন তিনি। আমরা তো পরশুদিন চলে যাব। এরমধ্যে রবিনকে নিয়ে তুমি সব ঘুরে টুরে দেখ।

ছোটমামা বললেন, আমি একটু সেন্টমার্টিন দ্বীপে যেতে চাই।

যাও।

আপনি ব্যবস্থা করে দেবেন?

আচ্ছা দেব। কবে যাবে?

কাল পরশু।

পরশু গেলে তো তুমি আর আমাদের সঙ্গে ঢাকায় ফিরতে পারছ না!

ঢাকায় আমি পরে ফিরব।

ঠিক আছে।

তারপর নিজের অজান্তেই সম্পূর্ণ অন্যরকম একটি কথা বললেন ছোটমামা। রবিনও আমার সঙ্গে যাবে।

কাল বুঝতে পারলেন না কথাটা তিনি নিজে বলেছেন না অন্য কেউ। এ কেমন করে হলো!

রবিন সেন্টমার্টিন দ্বীপে যাবে শুনে রবিনের মা একেবারে হা হা করে উঠলেন। তুই কি পাগল হয়েছিস, রবিন যাবে সেন্টমার্টিনে?

ছোটমামা কথা বলবার আগেই রবিনের বাবা বললেন, অসুবিধা কী? গেলে কী হয়েছে? আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব। ট্রানজিট বোটে করে যাবে। সকালে যাবে বিকেলে ফিরে আসবে। এসে এই বাংলোতে থাকবে। তারপর ঢাকা ফিরে যাবে।

না। সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপ। ওখানে আমার ছেলেকে আমি যেতে দেব না।

কোনও অসুবিধা নেই। এই সিজনে সমুদ্র একেবারে পুকুরের মতো। ছোট্ট ডিঙি নিয়েও সেন্টমার্টিনে চলে যায় লোকে। তুমি মানা কোরো না। ছেলেটা ঘুরে আসুক, অভিজ্ঞতা হবে।

তারপর ছোটমামার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, পরশুই যাও। আমরা চলে যাব ঢাকায় আর তোমরা সেন্টমার্টিনে।

ছোটমামা কথা বললেন না। কী রকম পাথর হয়ে আছেন তিনি। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে এসব হচ্ছে কী! আপা দুলাভাই এত সহজে রবিনকে যেতে দিচ্ছেন! সেন্টমার্টিনে! তিনি নিজে যেতে পারবেন কি না তারই নিশ্চয়তা ছিল না, বলা মাত্র সব ব্যবস্থা হয়ে গেল! এমনকি রবিনের যাওয়া পর্যন্ত। রবিনকে সঙ্গে নেয়ার কথা তো ভুলেও ভাবেননি ছোটমামা। তাঁর মনে ভেতর থেকে কে বলল কথাটা! টেকনাফে এসে সাধুসন্ত হয়ে গেল না তো রবিন! অলৌকিক কোনও ক্ষমতায় সেই ছোটমামাকে দিয়ে মা বাবার কাছে সেন্টমার্টিনে যাওয়ার কথাটা বলাল না তো!

এই প্রথম রবিনকে কেমন ভয় পেতে লাগলেন ছোটমামা।

□

Scanned By: Sisir Suvro